6/5

2/57

LIBRARY
No. ..2~~3~~6/
Shri ... BANARAS

২৩৬

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

৫/৪

(প্রথম খণ্ড)

LIBRARY
No. 2/57
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

LIBRARY
No. 6/5 2457
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ভূমিকা

বাঙ্গালা ১৩৩৮ সনে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এই সময় হইতে প্রায় এক বৎসর কাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার সঙ্গ করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছে। প্রত্যহই দুই তিন ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কাটাইতাম। সেই সময় মায়ের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক ঘটনা এবং অমৃততুল্য উপদেশ তাঁহার নিকট শুনিতে পাই। কিন্তু তখন ঐগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার কোন সঙ্কল্প মনে জাগে নাই বা উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি নাই। তখন মনে হইত মা চিরদিনই ঢাকা থাকিবেন এবং তাঁহার উপদেশও আমাদের যদৃচ্ছালভ্য থাকিবে। কিন্তু ১৩৩৯ সনে মায়ের জন্মোৎসবের অব্যবহিত পরই মা স্বর্গীয় জ্যোতিষবাবু ও বাবা ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঢাকা-নগরী ত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতেই মায়ের অভাব আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলাম এবং সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার লীলাস্মরণ ভিন্ন অন্য ভাবে তাঁহার সঙ্গ করিবার আর কোন উপায় রহিল না।

ইহার প্রায় দুই বৎসর পর ইন্‌কমট্যাক্সের সহকারী কমিশনার শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ মহাশয় তাঁহার এক আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে ঢাকা আগমন করেন। রমণা-আশ্রমে তাহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। তাঁহার নিকট শুনিতে পাইলাম যে, তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে মুশৌরী গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে মায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মা'র সহিত শচীকান্ত বাবুর এই প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু দেখিতে পাইলাম যে,

তিনি মা'র প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। মা'র সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ তিনি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আমি মায়ের সঙ্গ করিয়া যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি এবং মায়ের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে চাই, যেন উহা পাঠ করিয়া আপনারাও ঐ আনন্দের অংশীদার হইতে পারেন। আমার বিশ্বাস যে, আপনারাও যদি ঐরূপ করেন তবে পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান দ্বারা আমরা সকলেই উপকৃত হইতে এবং আনন্দলাভ করিতে পারিব।" শচীবাবুর এই প্রস্তাব আমার খুব সমীচীন বলিয়া মনে হইল। তখন হইতেই মায়ের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলাম। কিন্তু এতদিন পর ঐ সব কথা লিখিতে যাইয়া দেখি যে, উহার অধিকাংশই আমার স্মৃতিপট হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে! কেবল যে সব ঘটনা এবং উপদেশ আমার মনে গভীরতর রেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছিল সেইগুলিই উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম। ইহাতেও কিঞ্চিৎ ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে মনে করিয়া এগুলি বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে মাকে হৃষীকেশে পড়িয়া শুনান হইয়াছে এবং মা কিছু কিছু সংশোধন এবং পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে এবং উদ্দীপনায় ১৩৩৮ সন হইতে ১৩৪১ সন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে যে সব ঘটনা ও উপদেশ আমি আমার স্মৃতি-ফলক হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহাই এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত করা হইল। ১৩৩৮ সনের পর আর কখনও মায়ের সঙ্গ দীর্ঘকালব্যাপী করিতে পারি নাই। দীর্ঘাবকাশের পর মাঝে মাঝে মাত্র কয়েক দিনের জন্য তাঁহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে। তখন

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা তখনই ডায়েরীতে লিখিয়াছি এবং উহাই এই পুস্তকে প্রকাশ করা হইল। মা'র উপদেশামৃত যথাসম্ভব তাঁহার ভাষাতেই বিবৃত করা হইল। তাঁহার অতীত জীবনের যে সব কাহিনী শুনিয়াছি, অতিরঞ্জন দ্বারা উহাতে অলৌকিকত্ব আরোপ করিবার কোন অপচেষ্টাই এখানে করা হয় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাঠকমাত্রই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, এই পুস্তকে বর্ণিত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীর অনেকাংশেই কিছু কিছু অলৌকিকত্ব আছে। ইহা একরূপ অনিবার্য্য। যাঁহার অনুভূতিতে স্থূল ও সূক্ষ্মের চিরন্তন সীমা-রেখা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি নিস্ত্রৈগুণ্য, নিত্য, নিরঞ্জন পদে আরূঢ় থাকিয়া অদ্বয়, অখণ্ড চৈতন্যে স্থিতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপ যে আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে অলৌকিক ও দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হইবে ইহা আর বিচিত্র কি ? কারণ মানব দেহ ধারণের ছাড়পত্র পাইলেই কৈবল্যধামের অধিকার জন্মে না। তাই মাকে আমি যেমনটি দেখিয়াছি ঠিক তেমনই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যেন অপরেও মা'র জীবনী ও উপদেশ হইতে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারেন। আমার সিদ্ধান্ত অপরকে গ্রহণ করিবার জন্য কোন আমন্ত্রন করা হয় নাই, বা উহাকে গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয় নাই। লোকোত্তর চরিত্র স্বতঃই দুর্জ্ঞেয়। শ্রীশ্রীমা'র চরিত্র বিশেষতঃ এমন সর্ব্বতোমুখ, উহাতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের এমনি অপূর্ব্ব সমাবেশ যে, উহা যে কেহ সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া অপরের বোধগম্য করিতে পারিবেন এরূপ আমার প্রত্যয় হয় না। মা যে কি এবং কে এ প্রশ্ন হয়ত চিরদিনই অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে। তবে কিছুদিন মা'র সঙ্গ করিয়া এবং তাঁহার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির এক সহজাত

সমন্বয় লক্ষ্য করিয়া আমার যেন এই ধারণাই দৃঢ় হইতেছে যে দ্বাপরের শেষ ভাগে কুরুক্ষেত্র-রণপ্রাঙ্গনে যুদ্ধকামী রাজন্যবর্গের মহাপ্রলয়ঙ্কর শস্ত্রসম্পাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে মহতী বাণী স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল, আজ এতকাল পরে, কলির প্রদোষে, সেই বাণীই যেন মাতৃমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বের কল্যাণের জন্য ধরাধামে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত-গুপ্ত

১লা বৈশাখ, ১৩৪৫ সন। ৬।১ বক্সীবাজার, ঢাকা।

6/8

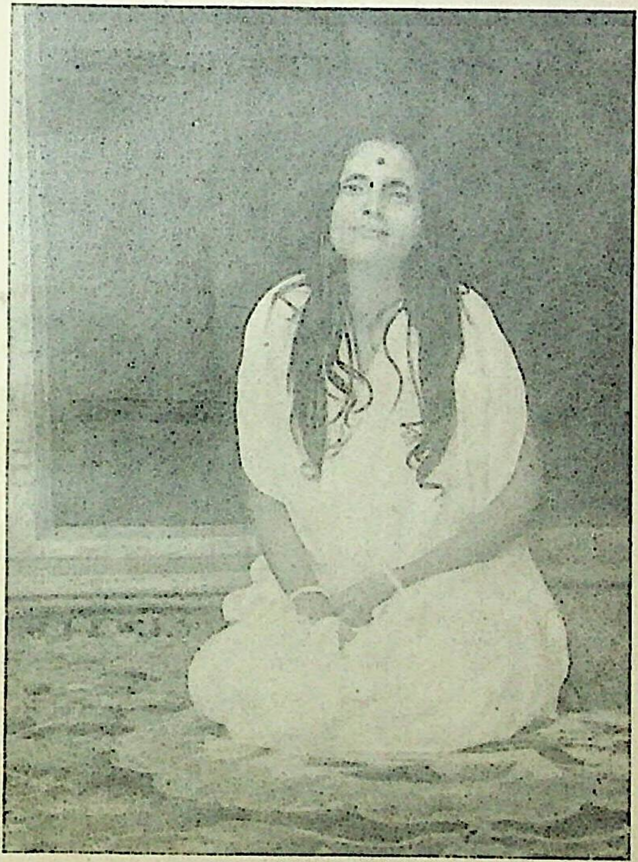

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

LIBRARY
No............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

LIBRARY
No. 2/57
Shree Shree Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীবনকথা ও উপদেশ।

(১)

১৩৩৮ সনের আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে মা'র সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অনেক দিন হইতেই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। কেহ কেহ তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন; আবার কেহ বা তাঁহার সম্বন্ধে অশ্লীল কটূক্তি করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিশেষ আগ্রহ করিয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিতে যাই নাই। তবে দেখা করিবার ইচ্ছা আগাগোড়াই ছিল। সময় না হইলে কিছুই হয় না বলিয়াই হয়ত বিলম্ব করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু * মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল। তিনি মা'র একজন ভক্ত। মা'র সম্বন্ধে প্রশংসা-সূচক দুই একটি কথা তাঁহার নিকট শুনিলাম; কিন্তু কথাগুলি বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত। উহা শুনিয়া যে মা'র সঙ্গে দেখা করিবার কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষা হওয়া তাহাও হইল না। একদিন জগদীশ বাবু কথাপ্রসঙ্গে আমাকে

---

* শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু। ইনি কৃষিবিভাগে চাকুরী করেন।

বলিলেন, "আপনি যদি মা'র সঙ্গে দেখা করিতে চান তবে, আমি আপনাকে লইয়া যাইতে পারি।" আমি এই সুযোগ অবহেলা করিলাম না। কারণ আমি ভাবিয়া দেখিয়াছিলাম যে আমার একা যাইয়া দেখা করা কখনও হইবে না, বিশেষতঃ একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে। কাজেই জগদীশ বাবুর প্রস্তাব আমি গ্রহণ করিয়া তখনই একদিন ধার্য্য করিয়া ফেলিলাম। মনে হয় সে দিনটা ছিল এক রবিবার। ভোররাত্রে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সকাল বেলাও আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্যদেব মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিলেন। রাস্তায় লোকজন খুব কম ছিল। রমণার মাঠ একরূপ জনশূন্য বলিলেই চলে। মনে হইল বৃষ্টি হইয়া ভালই হইয়াছে। হয়ত মা'র কাছে লোকের ভিড় হইবে না এবং মা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার সুবিধা হইবে। আমরা আলাপ করিতে করিতে রমণার মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আশ্রম কোথায় তাহা আমি জানি না শুনিয়া জগদীশ বাবু একটু বিস্মিত হইলেন। হইবারও কথা। মন্দিরটি বিস্তীর্ণ শ্যামল মাঠের মধ্যে আরক্তশীর্ষ উন্নত করিয়া সর্ব্বদাই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। অথচ আমি এমন অনুসন্ধিৎসাশূন্য যে এই মন্দিরটি কি বা কাহাদ্বারা স্থাপিত হইল এ সম্বন্ধে কোন দিন আমার মনে প্রশ্ন উঠে নাই, বা উহা দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষাও হয় নাই। যাহা হউক, আমরা উভয়ে অল্প সময় মধ্যেই আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলাম।

আশ্রমের প্রবেশ দ্বার পূর্ব্বদিকে। আশ্রমে প্রবেশ করিলেই পশ্চিম-দিকে টিনের ছাদ দেওয়া একটি নাতিবৃহৎ নাটমন্দির দেখা যায়। পরে শুনিতে পাইলাম যে উহা শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সেন (মুন্সেফ) মহাশয় তাঁহার কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং মা উহার নামাকরণ

করিয়াছেন "নাম ঘর"। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে ঐ মন্দিরে কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। উহার উত্তরদিকে ক্ষুদ্র গুহাসদৃশ একটি ইষ্টকনির্ম্মিত কোঠা আছে। উহার মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্ম স্থাপন করা হইয়াছে। এই কোঠার সংলগ্ন উত্তর দিকে আশ্রমের মন্দির। মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপিত আছে। বেদির উপর বিষ্ণু, অন্নপূর্ণা ও কালী মূর্ত্তি এক আসনেই স্থাপিত। বেদীর নীচে অন্য এক কালীমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ। অন্যান্য বিগ্রহের সহিত ইহারও পূজা হইয়া থাকে। ঐ ফটোগ্রাফ যে মূর্ত্তির তাহা বেদির নীচে এক গহ্বরে স্থাপিত। বৎসরে মাত্র একবার মা'র জন্মোৎসবের সময় ঐ মূর্ত্তি দেখা যায়। অন্য সময়ে গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ থাকে।

এই মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে একটি চৌচালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর আছে। উহার মেজ ও বারান্দা ইট দিয়া বাঁধান। উহাই মা'র থাকিবার ঘর। আমরা যখন আশ্রমে পৌঁছিয়াছিলাম মা তখন ঐ ঘরের বারান্দার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বসিয়াছিলেন। নিকটে একটি বর্ষীয়সী বিধবা বসিয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম ইনি বোধ হয় মা'র একজন পরিচারিকা, কিন্তু পরে জানিলাম যে তিনিও আমাদের মত একজন আগন্তুক।

জগদীশ বাবু মাকে চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। আমি একটু দূর হইতেই প্রণাম করিলাম। মা জগদীশ বাবুকে দেখিয়া তাঁহার বিমল শুভ্র হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজী, ভাল আছত ?" জগদীশ বাবু উত্তর করিলেন "হাঁ, মা, একরূপ আছি।" মা জগদীশ বাবুর মেয়েদেরও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার পর কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। পরে জগদীশ বাবু মাকে দিয়া কথা বলাইবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন "মা, কিছুই ভাল লাগে না।" মা বলিলেন, "ভাল না লাগিবারই ত কথা ;

কারণ তোমরা যে আনন্দেরই মূর্ত্তি। খণ্ড আনন্দ তোমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে কেন? অখণ্ড আনন্দের আস্বাদন তোমাদের ভিতরে রহিয়া গিয়াছে। দেখ না বাজারে যাইবার সময় তোমরা অনেক সময় বল যে বাজার হইতে এ তরকারী আনিও ও তরকারী আনিও; ইহার কারণ এই যে তোমরা ঐ ঐ তরকারী একবার খাইয়াছ এবং উহার আস্বাদ তোমাদের মুখে লাগিয়া আছে, তাই তাহা পুনরায় ভোগ করিবার জন্য উহা আনিতে বল। সেইরূপ তোমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে সচ্চিদানন্দের আস্বাদন আছে, এবং সংসারে সেই আনন্দের খোঁজ করিয়াই বেড়াইতেছ। কখনও মনে করিতেছ আনন্দ বুঝি ধনে, কখনও মানে, কখনও বা পুত্রকন্যায়—এইরূপ একটা না একটা ধারণা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছ; কিন্তু কোন জিনিষই সেই সচ্চিদানন্দের আনন্দ তোমাদিগকে দিতেছে না। তাই শান্তি পাও না, কিছুই স্থায়ীভাবে ভাল লাগে না।" জগদীশ বাবু বলিলেন, "তবে উপায় কি?" মা বলিলেন "নাম করিয়া যাও, সর্ব্বদা নাম কর তাহাতেই সব পাইবে। শান্তি, মুক্তি সবই নাম হইতেই হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "যদি শান্তি, মুক্তি নাম হইতেই হয় তবে গুরুর কোন প্রয়োজন নাই?" এতক্ষণ মা জগদীশ বাবুর দিকে চাহিয়া কথা বলিতেছিলেন। আমার প্রশ্ন শুনিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেশ, বাবা, তুমি যদি মনে কর যে গুরু না পাইলে তোমার চলে, তাহাতে দোষ কি? তুমি এম্নিই নাম কর, তাহাতেই হইবে।

জগতে কোন জিনিষই বৃথা যায় না। এই যে গাছের একটি পাতা পড়িতেছে, ইহাও বৃথা নয়। তুমি লক্ষ্য কর আর না কর, ইহাও তোমার উপর ছাপ রাখিয়া যাইতেছে; হয়ত সময় মত ইহা আবার জাগিয়া উঠিবে। তাই নাম করিলে ফল পাইবেই। তবে কিনা রোগী যেমন অনেক দিন ভুগিতে ভুগিতে দুর্ব্বল ও সামর্থ্যহীন হইয়া মনে করে যে তাহার বিছানার কাছে যদি কেহ বসিত তবে তাহাকে ধরিয়া সেও একটু বসিতে পারিত। একা উঠিয়া বসা তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত; সেইরূপ কেউ কেউ নিজে নিজে সাধন করিতে করিতে ক্লান্ত ও নিরাশ হইয়া ভাবে যে যদি একজন গুরু থাকিত তবে তাঁহার সাহায্যে সে আরও অগ্রসর হইতে পারিত। মানুষ উপলক্ষ্য ভিন্ন চলিতে পারে না বলিয়া গুরুর দরকার, তবে গুরু ব্যতীত যে ভগবানকে ডাকা যায় না এমত নহে।" এইরূপ আরও অনেক কথা মা বলিলেন। কথাগুলি খুব মধুর লাগিল। আর মা'র সদাই সাহাস্য বদন। মাঝে মাঝে হাসির লহরী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। এ হাসিও অভিনব। আমাদের হাসির মত ইহা দুঃখ ও নৈরাস্য মিশ্রিত নয়। ইহা গোমুখী-নিঃসৃত গঙ্গাধারার মত অনাবিল, উদ্দাম। ইহার পুণ্য ধারা দেহ মন, প্রাণ সমস্তই যেন প্লাবিত করিয়া দেয়।

ইহার পর আর অনেক দিন পর্য্যন্ত মা'র সঙ্গে দেখা করি নাই। তাহার পর আমাদের পূজার ছুটি হইল। ঐ সময়ে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সপরিবারে আমি কাশী চলিয়া গেলাম। কাশীর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (মহামহোপাধ্যায়) শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম্.এ মহাশয়

একজন স্বনামধন্য লোক। ছেলেবেলা হইতেই তিনি আমাকে সোদর-প্রতিম স্নেহ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ এবং সাধনভজনেও তিনি খুব উন্নত। তিনি শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের শিষ্য। একদিন তাঁহার বসিবার ঘরে আমি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কয়েকখানা ফটো দেখিতে পাইলাম। ঐ গুলি তাঁহার গুরুদেবের ফটোর পার্শ্বে রক্ষিত ছিল। গোপীনাথ বাবুর মধ্যে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। সকল মহাপুরুষের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধান্বিত। মা'র ফটো গোপীনাথ বাবুর ঘরে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি এগুলি কোথায় পাইলেন?" মা'র সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, হরিদ্বারে মা আমার বাসায় ৭।৮ দিন ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহাকে কাশীতেও দেখিয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, মাকে দেখিয়া আপনার কি মনে হয়? তিনি কোন stageএর লোক?" গোপীনাথ বাবু দার্শনিক পরিভাষায় একটি stageএর নাম করিলেন যাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" তিনি উত্তর করিলেন, "তবে আবার 'কোন stage' এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?" অজ্ঞ হইয়া প্রজ্ঞাবানের মত কথা বলিবার চেষ্টার জন্য আমি একটু লজ্জিত হইলাম, যদিও লজ্জিত হইবার আমার কোনও কারণ ছিল না; কেন না গোপীনাথ বাবুর নিকট পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের দুরাকাঙ্ক্ষা আমার স্বপ্নেও মনে আসে নাই। যাহা হউক আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি সাধারণ ভাবে আমাকে বুঝাইয়া বলুন যে মা'র কি অবস্থা।" গোপীনাথ বাবু বলিলেন, "মা'র কথা শুনিয়া ও তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে মা'র পূর্ণজ্ঞানের অবস্থা।" এ কথার অর্থও যে আমি বেশ উপলব্ধি করিতে

পারিলাম তাহা নহে, তবে মনে হইল মা সেই সব প্রাচীন মন্ত্রদ্রষ্টাদেরই একজন যাঁহারা একদিন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

পূজার বন্ধের পর যখন আবার ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম তখন হইতে দুইবেলাই মা'র নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম। সকাল বেলা কলেজের কাজ শেষ করিয়া মা'র নিকট ২।১ ঘণ্টা কাটাইয়া আসিতাম। বৈকাল বেলা স্ত্রী ও কন্যাদিগকে লইয়া যাইতাম। সকাল বেলা সব চেয়ে ভাল লাগিত, কারণ এই সময়ে লোকের বিশেষ ভিড় থাকিত না; মা'র শ্রীমুখ হইতে অনেক কথা শুনা যাইত। কখনও তিনি তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর উল্লেখ করিতেন; কখনও বা উপদেশ দিতেন। এক এক দিন কথা বলিতে বলিতে তাঁহার দিব্য ভাবাবেশ হইয়াছে বলিয়া মনে হইত—মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমাভ, চক্ষুদুটি উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময়, স্থির অথচ কোন বাহ্য বস্তুতে দৃষ্টি আবদ্ধ নহে। সারগর্ভ কথাগুলি নির্ঝরিনীর স্রোতের মত অবলীলাক্রমে বাহির হইয়া আসিতেছে এবং সে গুলিও যে শক্তিমন্ত তাহাও যেন স্পষ্ট অনুভব করা যাইত। এ সময়ের ভাব বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। যিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন। বৈকাল বেলা মা সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদ্বারা পরিবৃত থাকিতেন এবং আমাদের দুরধিগম্য ছিলেন। তবুও মাঝে মাঝে তিনি যখন মাঠে আসিয়া বসিতেন তখন একদিকে মেয়েরা বসিলেও আমরা অন্যদিকে বসিয়া মার কথা শুনিতাম।

একদিন সকাল বেলা কথাপ্রসঙ্গে মা তাঁহার জীবনের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "এমন একদিন ছিল যখন আমি পর্দ্দা-নসীন ঘরের বৌ ছিলাম। সমস্ত শরীর ঢাকিয়া প্রায় এক হাত

লম্বা ঘোমটা দিতাম। পাছে কেহ দেখিতে পায় তাই ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করিয়া থাকিতাম। যে ঘরে থাকিতাম তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতাম যেন একটি কুটাও এদিকে ওদিকে না থাকে। রান্না খাওয়া হইয়া গেলে শয়নের ঘরে প্রবেশ করিবার সময় হাত পা ধুইয়া খুব পবিত্র ভাবে প্রবেশ করিতাম। আর এখন লজ্জা নাই, সরম নাই, সকলের সঙ্গেই কথা বলিতেছি; শুচিঅশুচি বিচার নাই, আমি যে কি হইয়াছি!

"তখন আমরা শা'বাগে ছিলাম। ঐ স্থানে থাকা কালীন যখন রান্না করিতে বসিতাম তখন মাঝে মাঝে এক জায়গার ছবি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। ছবিটা আর কিছুই নয় উহা ঢাকা সিদ্ধেশ্বরীমন্দিরের ছবি। কিন্তু তখন তাহা জানিতাম না। তবে ছবিটা দেখিলেই মনে হইত যে উহা "সিদ্ধেশ্বরীতলার" ছবি। ভোলানাথকে * মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতাম যে ঢাকাতে সিদ্ধেশ্বরীতলা কোথায়। ভোলানাথ উহার কোন খবর দিতে পারিতেন না। তিনি একদিন সিদ্ধেশ্বরীতলা মনে করিয়া আমাকে

---

* ইনি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর স্বামী। ইঁহার কৌলিক নাম শ্রীযুত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী। 'ভোলানাথ' নাম মা ইঁহাকে দিয়াছেন। পশ্চিম দেশে ইনি 'রমা পাগলা' নামে খ্যাত। ইনিও একজন মহাপুরুষ। ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী, তারাপীঠ, উত্তরকাশী, জ্বালামুখী প্রভৃতি স্থানে ইনি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের এমন কোন তীর্থস্থান নাই যাহা ইনি পর্য্যটন করেন নাই। বাবা ভোলানাথকে কারুণ্যের অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীশ্রীমা'র সহস্রাধিক ভক্তগণকে ইনি পুত্রাধিক স্নেহ করেন। রোগশোকে তাপিত হইয়া লোকদিগকে বাবা ভোলানাথের শরণাপন্ন হইতে দেখিয়াছি।

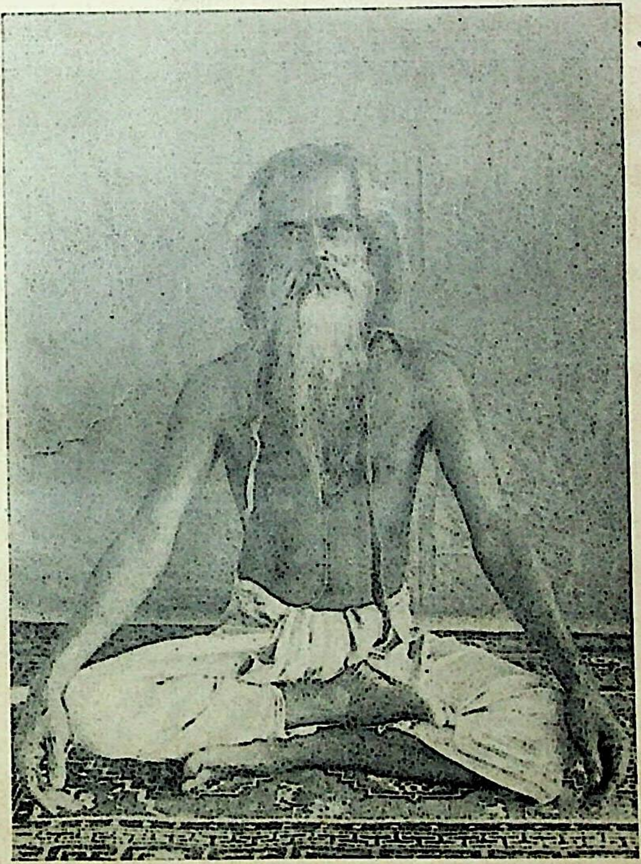

শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ (রমা পাগ্‌লা)

কি একটা জায়গায় লইয়া গেলেন কিন্তু আমি দেখিলাম যে আমি যে ছবি দেখি তাহা সে জায়গার নয়।

"এই সময় বাউলবাবু * প্রায়ই ভোলানাথের কাছে আসিত। তাহাকেও ঐ জায়গার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু সেও উহার কোন খবর দিতে পারে নাই। সন্ধ্যার সময় আমরা রমণার কালীবাড়ীতে আরতি দেখিতে যাইতাম। আরতি দেখিতে দেখিতে আমার কেমন যেন একটা ভাব হইত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত আমি তাহা বুঝিতেও পারিতাম না। কিছুদিন ঐভাবে কাটিলে একদিন পূজারী ভোলানাথকে বলিল, "আপনারা এই ভাবে এখানে এত রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকেন ইহাতে আমাদের বড় অসুবিধা হয় কারণ আমরা মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া অন্য কাজে যাইতে পারি না।" এই কথা শুনিয়া ঐ দিন হইতে আরতির পর আমি আর থাকিতাম না, বাসায় চলিয়া আসিতাম। আমাদের সঙ্গে বাউলবাবুও কালীবাড়ী যাইত। আমরা যখন বাসায় ফিরিয়া আসিতাম তখন সে মাঝে মাঝে পূর্ব্বদিকে চলিয়া যাইত। তখন ঐ সকল জায়গায় ভয়ানক জঙ্গল ছিল। কিন্তু বাউলবাবু খুব সাহসী ছিল। অন্ধকারে ঐ জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে সে একটুকুও ভয় পাইত না। একদিন ভোলানাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে এত রাত্রে

---

* শ্রীযুক্ত বাউলচন্দ্র বসাক। ইনি বাবা ভোলানাথের বাল্যবন্ধু। ঢাকা উকিল ইন্‌ষ্টিটিউসনে ইনি শিক্ষকতা করেন। শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্তদের মধ্যে ইনি অন্যতম।

জঙ্গলের ভিতর দিয়া কোথায় যায়। তাহাতে সে উত্তর করিল যে, সে সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী যাইতেছে। সিদ্ধেশ্বরীবাড়ীর কথা শুনিয়া আমি বলিলাম "এখানে আবার সিদ্ধেশ্বরীবাড়ী আছে না কি ?" সে উত্তর করিল, "হাঁ, আছে, একদিন তোমাদিগকে লইয়া যাইব।" তাহার পর একদিন রাত্রে সে ভোলানাথ ও আমাকে লইয়া সিদ্ধেশ্বরীবাড়ী গেল। সেইখানে পৌছিয়াই আমি দেখিলাম যে, যে জায়গা আমি এতদিন ছায়াচিত্রের মত দেখিয়া আসিতেছি, এ সেই জায়গা—সেই মন্দির, সেই বটগাছ, সবই সেই। আমি যাইয়া বটগাছটি স্পর্শ করিয়া দাড়াইলাম। এইরূপে সিদ্ধেশ্বরীবাড়ী দর্শন করিয়া আমরা শা'বাগে ফিরিয়া আসিলাম।

"একদিন দুপুর বেলা কোথায় যাইব মনে করিয়া আমি জিনিষ-পত্র গুছাইতেছি। কোথায় যে যাইব তাহা আমিও জানি না। ঘরের জিনিষগুলি সাজাইয়া রাখিতেছি; সঙ্গে লইবার জিনিষগুলি দিয়া একটা পুঁটলি করিয়াছি। এমন সময় ভোলানাথ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি হইতেছে ?" আমি উত্তর করিলাম, "চল, আজ আমরা আবার সিদ্ধেশ্বরীবাড়ী যাই।" ভোলানাথ কোন আপত্তি করিলেন না। আমরা বৈকালবেলা সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া হঠাৎ আমার খেয়াল হইল যে এখানে আমাকে সাতদিন থাকিতে হইবে। ভোলানাথের কাছে প্রস্তাব করাতে তিনি বলিলেন,

"তাহা হইবে কেমন করিয়া ? আমিত তোমার কাছে থাকিতে পারিব না। তুমি একা থাকিবে কি করিয়া ?" সেই সময় ভোলানাথ শা'বাগের বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। কুলীদিগকে ভোর বেলাই কাজকর্ম্ম দেখাইয়া দিতে হইত ; কাজেই তাঁহার পক্ষে বাগান ছাড়িয়া অন্যত্র রাত্রিবাস করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আমি বলিলাম, "আমি একা থাকিব তাহাতে কি ? আমি মায়ের * কাছে থাকিব, ইহাতে আবার ভয় কি ?" অগত্যা ভোলানাথ স্বীকৃত হইলেন। তিনি সন্ধ্যাবেলাই শা'বাগে যাইয়া ভোরে কুলীরা যে কাজকর্ম্ম করিবে তাহা দেখাইয়া দিয়া আসিতেন এবং রাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরীবাড়ীর ভোগের কোঠায় শুইয়া থাকিতেন। সিদ্ধেশ্বরীমন্দিরে মায়ের মূর্ত্তির পেছনে যে ক্ষুদ্র একটি কোঠা আছে তাহাতে আমি থাকিতাম। তুমি মনে করিও না যে এখানে আমি খুব সাধনভজন করিয়াছিলাম। সাধনভজন কিছুই করিতাম না, কেবল সেই ঘরে পড়িয়া থাকিতাম। কিন্তু কি যে এক আনন্দে আমার দিনরাত্রিগুলি কাটিয়া যাইত তাহা আমিও জানিতে পারিতাম না।

"বাউলবাবু যখন শুনিল যে আমি সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে সাতদিনের জন্য আশ্রয় নিয়াছি, তখন সে মনে করিল যে, নিশ্চয়ই এখানে

---

* সিদ্ধেশ্বরীমন্দিরে ৺মা কালীর বিগ্রহ আছে। স্থানটি খুব নির্জ্জন। এখানে পঞ্চমুণ্ডীর এক আসনও আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহা একটি সিদ্ধপীঠ বলিয়া গণ্য হয়।

কিছু অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটিবে। এই ভাবিয়া সে মায়ের মন্দিরের দ্বারে নন্দীর মত পাহারা দিতে লাগিল ; উদ্দেশ্য যে তাহার অগোচরে যেন কোন অলৌকিক ঘটনা না ঘটে। এইরূপে ছয় দিন ছয় রাত্রি কাটিয়া গেল। সপ্তম দিন রাত্রিতে হঠাৎ আমার খেয়াল হইল যে এখন আমাকে মন্দির ত্যাগ করিতে হইবে। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম যে ভোর হইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, যে বাউলবাবু এতদিন সমস্ত রাত্রি পাহারা দিয়া আসিতেছিল সে আজ ঘুমে অচেতন। ভোর রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল এবং তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। একটি প্রাণীও জাগিয়া নাই। কেবল ভোলানাথ জাগিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলাম। তিনিও আমাকে অনুসরণ করিলেন। আমি মন্দির হইতে বাহির হইয়া মন্দিরের পশ্চাতে যে জঙ্গল আছে উহার মধ্য দিয়া চলিলাম। কিছুদূর যাইয়া কিছু পরিষ্কার একটা জায়গা পাইলাম। প্রথমে ঐ জায়গাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে ঐ স্থানে বসিয়া পড়িলাম। ভোলানাথও আমার পার্শ্বে বসিলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। আমি যে স্থানে বসিয়াছিলাম, সেই স্থানে বসিয়াই ডানহাত দিয়া মাটিতে চাপ দিতে লাগিলাম। যদিও মাটি দেখিতে শক্ত ছিল, কিন্তু যতই চাপ দিতে আরম্ভ করিলাম আমার হাত ততই নীচের দিকে যাইতে লাগিল। এইরূপে আমার সমস্ত বাহু মাটিতে প্রবিষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া

ভোলানাথ ভয় পাইয়া আমাকে আসিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, "চল আমরা এখান হইতে উঠি।" * ইহা শুনিয়া আমিও হাত বাহির করিয়া আনিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমার হাতের চাপে যে গর্ত্ত হইয়াছিল উহা হইতে ফোয়ারার মত মোটা ধারায় এক জলের উৎস বাহির হইয়া আসিল। এ গুলি বৃষ্টির জল নয়, কারণ জলগুলি গরম ও লাল বর্ণের। ঐ লাল জলে আমার হাতের শাঁখা লাল হইয়া গেল। সে রং প্রায় সাতদিন পর্য্যন্ত ছিল। এই যে ব্যাপার হইল তাহা ভোলানাথ ছাড়া আর কেহ দেখিল না। এক ভৈরবী দূর হইতে আমাদিগকে ভোরের বেলা এই জঙ্গলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। সে মনে করিল আমরা বুঝি কোন গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু কাছে আসিয়া সে যখন দেখিল যে সেরূপ কিছু নয় তখন সে চলিয়া গেল।

এই গল্প বলার সময় খুকুনী দিদি † ছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনারা মাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই মা কেন ঐ জায়গায় বসিয়াছিলেন এবং কেনই বা ঐ স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি হইল?" দিদি বলিলেন,

---

* এ ঘটনাটি আমি বাবা ভোলানাথের নিকটও শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যখন ইহাকে সীতার মত পাতালে প্রবেশ করিতে দেখিলাম তখন তাড়াতাড়ি আসিয়া ইহাকে ধরিয়া ফেলিলাম আর বলিলাম, "এখানে থাকিয়া কাজ নাই। চল, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।"

† ইনি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংসারে অনাসক্তা এবং ধর্ম্মভাবাপন্ন। কিন্তু পিতামাতা উহা সম্যক বুঝিতে না পারিয়া কন্যার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেই তাহাকে এক সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন বংশে বিবাহ দেন।

"আপনি মনে করিয়াছেন যে উকিলের মত জেরা করিয়া মা'র নিকট হইতে কথা বাহির করা যায়। আসল কথার বেলায় মা চুপ। তিনি কেবল ঐ জায়গাটা বেড়া দিয়া রাখিতে বলিলেন, কিন্তু উহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না।"

কিছুদিন ঐ জায়গাটা বেড়া দিয়া রাখা হয়। শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল বসু‡ মহাশয়ের ব্যয়ে ঐ বেড়া হয়। পরে শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে, অখণ্ডানন্দজী) ঐ জায়গাটা বন্দোবস্ত নিয়া একটি আশ্রম তৈয়ার

এ বিবাহ একেবারেই নিষ্ফল হইল; কারণ বিবাহের পর যখন ইঁহাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাওয়া হইল তখন ইনি একদিনের জন্যও সাধারণের মত দাম্পত্যজীবন যাপন করিতে পারেন নাই। পরন্তু সময় সময় ইনি এমন ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিতেন এবং তখন ইঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া এমনি বিকল হইয়া যাইত যে ডাক্তারেরা ইঁহার মৃত্যুআশঙ্কা করিয়া ইঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ইহার পর হইতেই ইনি পিত্রালয়ে বাস করিতে থাকেন এবং সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন। উহা ব্যতীত জীবনে যে আর কিছু কাম্য থাকিতে পারে তাহা তিনি ধারণাও করিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ঢাকা আগমন করিলে শশাঙ্কবাবু যে দিন ইঁহাকে মায়ের নিকট লইয়া গেলেন সেই দিনই মা ইঁহার সহিত এমন ব্যবহার করিলেন যেন ইনি তাঁহার চিরপরিচিতা এবং অন্তরঙ্গ সখী। ঐ দিন হইতেই ইনি মা'র প্রধান সেবিকা হইলেন। ইঁহার জীবনচরিত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় ইনি যেন এতকাল শ্রীশ্রীমায়ের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইঁহার ধর্ম্মজীবন মা নিজ হাতে গড়িয়া নিতেছেন। ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও মা তাঁহাকে উপবীত ধারণ এবং বেদাধ্যয়নের অধিকার দিয়াছেন এবং ইঁহার নাম রাখিয়াছেন "গুরুপ্রিয়া"। সম্প্রতি ইনি শ্রীশ্রীমায়ের একখানি জীবনী লিখিয়াছেন।

‡ ইনি ঢাকার D. P. M. G. ছিলেন। ইনি বৈদ্যনাথ ধামের ৺বালানন্দ স্বামীর শিষ্য।

করেন। ইহাই ঢাকাতে মা'র আদি আশ্রম। শুনিয়াছি যে স্থানে মা গর্ত্ত করিয়াছিলেন আশ্রম হইবার পরও উহা পূর্ব্বাবস্থাতেই রাখা হয় এবং মা ঐ স্থানে বসিয়া অধিক সময় ভাবাবস্থায় কাটাইতেন। এখন ঐ স্থানে শিবস্থাপন করা হইয়াছে। এই আশ্রমটি সিদ্ধেশ্বরীমন্দিরের পশ্চাৎদিকে। স্থানটি খুব নির্জ্জন এবং সাধন ভজনের অনুকূল। যাঁহারা এই স্থানের অতীত ইতিহাস জ্ঞাত আছেন তাঁহারা হয়ত এই স্থানের মাহাত্ম্য এবং এইস্থানে আসিয়া মা যে সব অদ্ভুত আচরণ করিয়াছিলেন তাহার কারণ কিঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারিবেন। এই স্থানের সঙ্গে মা'র বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলে এই স্থানের চিত্র দিব্যদৃষ্টিতে দেখা এবং রাত্রিশেষে মন্দির ত্যাগ করিয়া দুর্যোগের মধ্যে এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা প্রভৃতি যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। এগুলি সুধু অর্থশূন্য খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না; কারণ এ খেয়ালের মধ্যে অতীতের সহিত একটা যোগাযোগ স্পষ্টই বুঝা যায়, যদিও উহা স্পষ্টরূপে ধারণা করা আমাদের অসাধ্য। মাও এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব।

আর একদিন সকাল বেলা মা'র নিকট যাইতেছি পথে দিদিমার বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সেইখানে গিয়া প্রণাম করিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মা শা'বাগ দেখিবার মানসে রওনা হইলেন। আমিও তাহার অনুগমন করিলাম। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম একজন লোক একটি ছাগশিশুর গলায় দড়ি দিয়া ৺ঢাকেশ্বরী বাড়ীর দিকে টানিয়া নিতেছে; আর ছাগশিশুটি প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে। মা উহার দিকে একটু তাকাইয়া বলিলেন, "তোমার আর বেশীক্ষণ চীৎকার করিতে হইবে না।" আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মা

বলি না দিলে কি পূজা হয় না ?” মা বলিলেন “হইবে না কেন ?” আমি বলিলাম “তবে লোকে বলি দেয় কেন ?” মা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “ইহা বোঝে ক’ জনা।” এইরূপ কথা হইতে হইতে আমরা শা’বাগে আসিয়া পৌঁছিলাম।

শা’বাগ এককালে ঢাকার নবাবদের বিলাসনিকেতন ছিল। ইহা রমণার ঘোড়দৌড়ের মাঠের পশ্চিম দিকে এক বিশাল ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত। এই বাগানটি ফলফুলের গাছে পরিপূর্ণ। ইহার ভিতর ছোট বড় কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ আছে। পাথর দিয়া বাঁধান নাচঘরটি দেখিতে খুব সুন্দর। উহার পার্শ্বেই বড় একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিদিকে দেশী ও বিলাতী ফুলের মনোরম উদ্যান। ইহা ব্যতীত বেগমদিগের স্নানের জন্য আগাগোড়া বাঁধান একটি পুকুর, উহা কৃত্রিম উপায়ে জলে পরিপূর্ণ করা হইত এবং ঐ জল বাহির হইবার প্রণালীও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুকুরের চারিদিক উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা। এ বাগান এত বৃহৎ যে ইহার অধিকাংশ সংস্কারাভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। অতি সামান্য অংশই বর্ত্তমান নবাবপরিবারের লোকদ্বারা সুচারুরূপে রক্ষিত হইতেছে। এই বাগান একজন মুসলমান কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে আছে। সাধারণের ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু মা’র সর্ব্বত্রই অবারিত দ্বার। কি হিন্দু, কি মুসলমান, যাহারা মাকে জানে, তাহারা তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। মা’র সঙ্গে ছিলাম বলিয়া আমাদেরও বাগানে প্রবেশ করিতে বেগ পাইতে হইল না। মা আমাকে নানা স্থান ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এককালে এই বাগান বাবা ভোলানাথের তত্ত্বাবধানেই ছিল, তখন মা এই বাগানেই বাস করিতেন। তিনি যে ঘরে ছিলেন তাহা দেখাইলেন,

যে স্থানে কীর্ত্তনাদি হইত তাহা দেখাইলেন, যে গৃহে কালীপূজা হইয়াছিল তাহাও দেখাইলেন। এই কালীপূজারও একটি ইতিহাস আছে, তাহা মা অন্য একদিন বর্ণনা করিয়াছিলেন।

শা'বাগের মধ্যে এক মুসলমান ফকিরের কবর আছে। মা আমাকে সেই কবরও দেখাইলেন। কবরটি একটি দালানের মধ্যে এবং ঐ দালানের দরজা বাহির হইতে তালা দিয়া বন্ধ। তবে দালানটির কতক অংশে জালী থাকায় বাহির হইতে ভিতর দেখা যায়। এই ফকির সম্বন্ধে মা বলিলেন, "আমি যখন বাজিতপুরে ছিলাম তখন এই ফকিরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় এবং শা'বাগে আসিয়াও বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। বাবাজী যেন আমাকে এখানে ডাকিয়া আনিতেই বাজিতপুরে দেখা দিয়াছিলেন।" অবশ্য মা যে সময়ের কথা বলিতেছেন তাহার অনেক পূর্ব্বেই ফকির সাহেব দেহত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই মা'র সঙ্গে যে দেখা তাহা ফকির সাহেবের অশরীরী অবস্থায় হইয়াছে। মা বলিতে লাগিলেন, "প্রথম যখন বাবাজীর সঙ্গে দেখা হয় তখন আমার মনে হইল ইনি আরবদেশের এক মহাপুরুষ। আমি অবশ্য তখন জানিতাম না যে আরবদেশ বলিয়া কোন দেশ আছে কি না এবং তাহা কোথায়। আমি যখন ভোলানাথকে বলিলাম যে, আমি আরবদেশের একজন মহাপুরুষ দেখিলাম তখন ভোলানাথ কতকটা অবাক্ হইয়া বলিলেন, "তুমি হিন্দু দেবদেবীর পরিবর্ত্তে এ আবার কি দেখিতেছ ? ইহার অর্থত আমি বুঝিতেছি না।" পরে যখন শা'বাগে আসিয়া এই কবর দেখিলাম তখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে আরবদেশের এক ফকির এই স্থানে আসিয়া

কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন এবং তিনি এই বাগানেই দেহরক্ষা করেন। নবাব-পরিবারের লোকেরা তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া ফকিরের দেহ এই বাগানের মধ্যেই কবর দেওয়া হয়। বাবাজীর সহিত এক শিষ্যকেও দেখিয়াছিলাম এবং ঢাকাতেও আবার শিষ্যসহ বাবাজীর সঙ্গে দেখা হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঢাকাতে কতবার তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে ?" মা বলিলেন, "একবার", এবং যে স্থানে ফকির সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা আমাকে দেখাইলেন। তাহা ছাড়া একটা ঝোপ দেখাইয়া বলিলেন, "মাঝে মাঝে এই ঝোপ হইতে ধূপের গন্ধ বাহির হইত।" এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইল যে শা'বাগ বিলাসব্যসনের নিকেতন হইলেও ইহা মহাপুরুষদের আবাসস্থলও বটে, যেহেতু বিনা কারণে কোন স্থান হইতে ধূপাদির সুগন্ধ বাহির হইলে তথায় মহাপুরুষদের সান্নিধ্যই সূচিত হয়। যাহা হউক মা এই ফকিরের কবরের নিকট দাড়াইয়া এই গল্পটি বলিলেন—

"একদিন নাচঘরে কীর্ত্তন হইতেছে, কীর্ত্তনের মধ্যে আমার ভাবাবেশ হইল। আমি ভাবাবেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া কিছুদূরে একটি মুসলমান দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া তাহাকে আমার সঙ্গে আসিতে ইসারা করিলাম। সে বিনা বাক্যব্যয়ে আমার পিছনে পিছনে চলিল। তাহাকে লইয়া আমি এই কবরের নিকট আসিলাম। এই মুসলমানটির চেষ্টাতেই ঘরের তালা খোলা হইল ভিতরে গিয়া আমি কবরের দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইলাম এবং ঐ লোকটি উত্তর দিকে দাঁড়াইল। এ দিকে আমার এমন

এক ভাব হইল যে আমার নড়িবার চড়িবার শক্তি রহিল না। নমাজের সময় মুসলমানেরা যেরূপ নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করে, ক্রমে আমারও আপনা হইতেই সেই সব অঙ্গভঙ্গি হইতে লাগিল এবং মুখ হইতে একরূপ ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল যাহার এক বর্ণও আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে সমস্তই থামিয়া গেল এবং আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। ইহার কিছুদিন পর এই কথা যখন রাষ্ট্র হইল তখন নবাববাড়ী হইতে নবাবজাদী পরীবাণুর পুত্র, পুত্রবধূ, মেয়ে এবং জামাতা আসিয়া আমাকে ধরিল যে, তাহাদিগকেও আমার নামাজ পড়া দেখাইতে হইবে। আমি বলিলাম যে আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই করি নাই, সমস্তই আপনা হইতে হইয়া গিয়াছিল। আমি ইচ্ছা করিয়া তাহা সে রকম আর করিতে পারিব না। কিন্তু তাহারা আমাকে ছাড়িল না। আমাকে লইয়া পুনরায় সেই কবরের নিকট গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখানে কিছুক্ষণ থাকার পর পূর্ব্বদিনের মত আমার আবার ভাবাবেশ হইল এবং আপনা হইতেই সেই সব অঙ্গভঙ্গি হইতে লাগিল ও মুখ হইতে সেইরূপ ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল। উহা শুনিয়া নবাবজাদী পরীবাণুর পুত্রবধূ বলিয়া উঠিল, "ইনি দেখি কোরাণের কথা বলিতেছেন।"

মা এই গল্প বলিয়া আমাকে ঐ মহাপুরুষের শিষ্যের কবর দেখাইতে লইয়া গেলেন। ইহার কবরের উপর কোন গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। কবরটি কতকগুলি বৃক্ষের নীচে অবস্থিত এবং বৃক্ষগুলি যেন সযত্নে এই

গোরস্থানটি রক্ষা করিতেছে। আমি ভক্তিভাবে গুরু ও শিষ্যের সমাধিস্থানে প্রণাম করিলাম। তাহার পর আমরা বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। এখন মনে হইতেছে যে, মা কৃপা করিয়া আমাকে এই সব পুণ্যস্থান দেখাইতে শা'বাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে হঠাৎ ওখানে যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আর একদিন মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গহ্বরে রক্ষিতা কালীমূর্ত্তির গল্প আরম্ভ করিলেন। গল্পটির সমস্ত অংশ খুব স্পষ্ট স্মরণ নাই তবে মর্ম্ম কতকটা এইরূপ—

মা যখন শা'বাগে ছিলেন তখন হইতেই দুই একটি করিয়া ভক্তসমাগম আরম্ভ হয়। নানা লোক তখন নানা কথাই বলিত। বেগম পরীবাণুর অংশের ম্যানেজার রূপে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র বসু মহাশয় অন্যান্য সম্পত্তির সহিত শা'বাগেরও তত্ত্বাবধান করিতেন এবং ইঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াই বাবা ভোলানাথ ঐ বাগানের রক্ষক হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভোলানাথের পরিচিত ও অপরিচিত অনেক লোক শা'বাগে যাইয়া মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করিতেন। ঐ বাগানে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ ছিল এবং ঐ নিষেধ সত্ত্বেও যে লোক তথায় যাতায়াত করিত তাহা জানিয়াও যোগেশবাবু উহা বন্ধ করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। একদিন যোগেশ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কতকগুলি লোককে ঐ বাগানে দেখিয়া পিতার নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে শা'বাগে সর্ব্বসাধারণ প্রবেশ করিয়া হল্লা করে এবং বাগানের গাছপালাও নষ্ট করে; এমতাবস্থায় যে লোকটিকে বাগানের রক্ষক হিসাবে রাখা হইয়াছে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া হউক। প্রফুল্লবাবু না কি ভোলানাথকেও এই সম্বন্ধে

অনুযোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে ভোলানাথ এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিতেই চাহিয়াছিলেন, কেবল মা'র অনুরোধে তাহা করিতে পারেন নাই। মা বলিয়াছিলেন, "দেখা যাক্ না কি হয়। চাকুরী সকল সময়ই ছাড়িতে পারিবে।" প্রফুল্লবাবুর অভিযোগের পর একদিন যোগেশবাবু ও ভূদেববাবু বাগানে অনুসন্ধান করিতে আসেন। যোগেশবাবু ভোলানাথের নিকট প্রস্তাব কল্লেন যে, তিনি মাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া যাইতে চা'ন, ইহাতে ভোলানাথের কোন আপত্তি আছে কি না। ভোলানাথ মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার কোন আপত্তি নাই। তদনুসারে যোগেশবাবু মাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাহাকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। মা'র উত্তরে তিনি এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, ঐ সময় হইতে তিনিও মা'র একজন ভক্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর হইতেই শা'বাগে কীর্ত্তনাদিতে কোন আপত্তি হয় নাই। এদিকে প্রফুল্লবাবু নবাবষ্টেটে যে চাকুরী করিতেন তাহা শেষ হইল। যে দিন শেষ হইল তিনি সেই দিনই মাকে বলিলেন, "মা, আমার চাকুরী গিয়াছে, এখন আমি কি করিব?" মা উত্তর করিলেন, "তোমার সময় ভাল নয়।" প্রফুল্লবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন ভাল হইবে? "মা উত্তর করিলেন, "আটমাস পর।" সত্য সত্যই দেখা গেল যে, ঠিক আটমাস পর প্রফুল্লবাবু কুমিল্লা Court of wardsএ চাকুরী পাইলেন। ইহাতে মা'র প্রতি তাঁহার ভক্তিবিশ্বাস গাঢ়তর হইল। পরে যোগেশবাবু এবং ভূদেববাবুর দুই পরিবারই মা'র বিশিষ্ট ভক্ত হইয়া পড়িলেন। এই দুই পরিবারে উপর মা'র একটু বিশেষ কৃপাও লক্ষিত হইয়াছে।

যাহা হউক শা'বাগে সর্ব্বসাধারণের যাতায়াত সম্বন্ধে গণ্ডগোল নিষ্পত্তি হইয়া গেলে কয়েকজন ভক্তের উৎসাহে শা'বাগে কালীপূজার প্রস্তাব হয়।

বোধ হয় এই পূজা দীপান্বিতা উৎসব উপলক্ষ্যে হইয়াছিল। মা'র নিকট অনুমতি চাহিলে মা অনুমতি দিলেন। কালীপূজার চারি দিন পূর্ব্বে মা গাড়ী করিয়া শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছিলেন। ঐ গাড়ীতে মা, ভোলানাথ, শশাঙ্কবাবু ও তাঁহার কন্যা খুকুনীদিদি ছিলেন। গাড়ী পল্টনের মাঠে নবাবের বাগানের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর নিকট পৌঁছিয়াছে তখন দেখা গেল যে, মা পুকুরের দিকে মুখ করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতেছেন। ঊর্দ্ধে কিছু দেখিতে হইলে লোকে যেরূপ এক হাত চোখের উপর স্থাপন করে মার এক হাতও সেইরূপ স্থাপিত ছিল। চক্ষু পলকহীন, মুখে এক দিব্য জ্যোতিঃ। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া মা আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু তিনি কি দর্শন করিলেন সে বিষয় নানা প্রশ্ন করিয়াও উত্তর পাওয়া গেল না। পরে শশাঙ্কবাবুর বাসায় মা যখন ভোজন করিতে বসিলেন তখন ভোজন করিতে করিতে আবার বাম হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া নিষ্পন্দদৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া রহিলেন, আর সকলে অবাক্ হইয়া মাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। যখন এই ভাবটি কাটিয়া গেল তখন ঊর্দ্ধে দুইবার মা কি দেখিলেন তাহা জানিবার জন্য উপস্থিত সকলেই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও মা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিছুদিন পর মা নাকি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি দুইবারই শূন্য হইতে কালীমূর্ত্তি ঝাপাইয়া পড়িতে দেখিয়াছিলেন। আশ্রমের মন্দিরে বেদীর উপরে অন্নপূর্ণামূর্ত্তির পার্শ্বে যে কালীমূর্ত্তি আছে তাহা নাকি উল্লিখিত কালীমূর্ত্তির অনুরূপ; ইঁহাকেও শূন্যে স্থাপন করা হইয়াছে এবং ইঁহার পদতলে মহাদেবের মূর্ত্তি নাই।

যাহা হউক, শশাঙ্কবাবুর বাসায় ভোজন সমাপন করিয়া মা যখন শা'বাগে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এ দিকে কালীপূজা

সন্নিকট, মা সমাধিস্থ হইয়া আছেন, কত বড় মূর্ত্তি তৈয়ার করিতে হইবে এ সম্বন্ধে মার কোন আদেশই পাওয়া যাইতেছেনা দেখিয়া ভক্তগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন বাবা ভোলানাথের মাথায় এক খেয়াল আসিল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, ইনি সেদিন ভাবাবস্থায় যে ভাবে হাত তুলিয়া বসিয়া ছিলেন ইহাকে ঠিক সেই ভাবে বসাইয়া একটা মাপ লওয়া হউক এবং সেই মাপেই কালীমূর্ত্তি তৈয়ার করা যাক্।" তখন মাকে সমাধিস্থ অবস্থাতেই ধরিয়া বসান হইল এবং তিনি যে-ভাবে একহাত ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া স্থির নয়নে আকাশপানে তাকাইয়া ছিলেন, সেই ভাবে একখানা হাত ঊর্দ্ধদিকে ধরিয়া রাখা হইল এবং কোমর হইতে ঐ হাত পর্য্যন্ত যষ্ঠিদ্বারা একটা মাপ লওয়া হইল। কিন্তু দেখা গেল যে, এই মাপে ফরমাইস দিয়া মূর্ত্তি তৈয়ার করিতে গেলে নির্দ্দিষ্ট দিনে পূজা হইবে না। তখন এত বড় তৈয়ারী মূর্ত্তি বাজারে পাওয়া যায় কি না তাহা অনুসন্ধান করিতে কয়েকজন বহির্গত হইলেন; কেন না দীপান্বিতা উপলক্ষ্যে অনেক তৈয়ারী মূর্ত্তি বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। অনেক খোঁজ করিয়া দেখা গেল যে, মাত্র একটি দোকানে আট খানা মূর্ত্তি আছে উহার মধ্যে একখানা মূর্ত্তি ঐ মাপের অনুরূপ। মূর্ত্তিখানার রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নয়, সবুজ ও নীল রং মিশ্রিত করিলে যে রং হয় উহা তদনুরূপ। শুনা গেল যে, কারিকর তাহার আপন ইচ্ছাতেই ঐ মূর্ত্তিখানি বড় করিয়া তৈয়ার করিয়াছিল। সব কয়খানা মূর্ত্তিই বিক্রীত হইয়াছিল কেবল ঐ মূর্ত্তিখানিই হয় নাই। ঐ মূর্ত্তিখানি ক্রয় করিয়া শা'বাগে লইয়া আসা হইল। এই পূজা উপলক্ষ্যে নাকি মা'র অনেক বিভূতি প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা মা'র মুখে শ্রবন করি নাই বলিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম না। এই মূর্ত্তি আর বিসর্জ্জন দেওয়া হয় নাই এবং এই কালীপূজা উপলক্ষ্যে যে হোমাগ্নি প্রজ্জলিত করা হইয়াছিল তাহাও নির্ব্বাপিত করা হয় নাই।

এই মূর্ত্তি মা'র সহিত টিকাটুলি, উত্তমাকুটীর এবং সিদ্ধেশ্বরীআশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে যখন রমনাতে আশ্রম স্থাপন করা হয় তখন এই আশ্রমেই ইহা রক্ষিত হয়। তখন আশ্রম বলিতে মা'র জন্য একখানা খড়ের কুটীর ও প্রতিমার জন্য একখানা টিনের একচালা বুঝাইত। এই সময় প্রতিমার অঙ্গ হইতে স্বর্ণালঙ্কার অপহৃত হয়। যখন এই অলঙ্কার অপহৃত হয় তখন মা কক্সবাজারে ছিলেন। শুনা যায় যে, যে দিন প্রতিমার অঙ্গহানী করিয়া অলঙ্কার লওয়া হয় ঠিক সেই দিন কক্সবাজারে মা তাঁহার হাতখানা ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। এই গল্প অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই বলিয়া এখানে ইহা উল্লেখ করিলাম যদিও এ সম্বন্ধে মা আমাকে কিছু বলেন নাই। ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মা মূর্ত্তির সংস্কার সাধন করেন এবং পরে বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তুত হইলে বেদীর অভ্যন্তরে গহ্বরের মধ্যে ঐ মূর্ত্তি স্থাপিত করেন।

আর একদিন কলেজ হইতে রমনার আশ্রমে যাইয়া দেখি যে, সেখানে আরও অনেক ভক্ত আছেন এবং মা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। মা'র কথা শুনিতে শুনিতে অনেক বেলা হইল। এমন সময় এক ভক্ত কথায় কথায় সর্পবিষয়ক একটি গল্পের ইঙ্গিত করিলেন। আমি উহা বুঝিতে না পারিয়া মাকে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলাম। মা বলিলেন, "সাপের অনেক গল্প আছে, আর একদিন তাহা বলিব। এখন বেলা হইয়াছে বাড়ী যাও।" পরে এক শনিবার সকাল বেলা যখন সিদ্ধেশ্বরীআশ্রমে মা'র সঙ্গে দেখা করিতে যাই, তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সর্পের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। মা বলিতে লাগিলেন, "কুঞ্জবাবুর * এক

* শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়। ইনি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। ইনিও এখন সন্ন্যাসী। মা ইহার নাম স্বামী তুরীয়ানন্দ রাখিয়াছেন। আজ কাল অধিকাংশ সময় ইঁনি পুরীধামে বাস করেন।

ছেলের কোষ্ঠীতে লেখা ছিল যে তাহার "দন্তাঘাতে" মৃত্যু হইবে। কুঞ্জবাবু ছেলেটিকে আনিয়া আমার কাছে রাখিয়া যাইতে চাহিল। আমি বলিলাম, "আমার কাছে রাখিবার প্রয়োজন নাই, উহাকে তোমাদের কাছেই রাখ।" ইহার কিছু দিন পর আমাদের বিদেশে যাইবার কথা হইল; ভোলানাথও বিদেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তখন আমরা শা'বাগে ছিলাম। তাঁহার সঙ্গে এক সর্ত্ত করিলাম যে বাসা হইতে রওনা হইয়া ষ্টেশনে পৌঁছিতে যদি কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে কোথায়ও যাওয়া হইবে না, আমরা আবার শা'বাগে ফিরিয়া আসিব। একদিন ভোরবেলা কেবল ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া রওনা হইলাম। সে দিন এমন হইল যে, একটি পরিচিত লোকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল না। যাহারা সকাল বেলা বাগানে কাজ করিত তাহারা সে দিন অনুপস্থিত। জ্যোতিষ বাবুও* শা'বাগের কাছে একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া পীড়িতাবস্থায় ছিল। সে প্রত্যহ প্রাতে ঐ

---

* ৺জ্যোতিষচন্দ্র রায় ("ভাইজী")। ইনি শ্রীশ্রীমায়ের একজন বিশিষ্ট ভক্ত। ইনি Director of Agriculture এর Personal Assistant ছিলেন। মা যে সময়ের কথা বলিতেছিলেন তখন ইনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া রমনায় বাসা করিয়াছিলেন। এই কাল রোগ হইতে ইনি যে কেবল মা'র কৃপাতেই রক্ষা পাইয়াছিলেন ইহা সর্ব্বজন-সুবিদিত। ১৩৪৪ সনে ৺জ্যোতিষবাবু, মা ও বাবা ভোলানাথের সঙ্গে, কৈলাস গমন করেন এবং ফিরিবার পথে রোগাক্রান্ত হইয়া আল্‌মোড়াতে দেহরক্ষা করেন। "সৎবাণী", "মাতৃদর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহারই লেখা। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে।

বাসার বারান্দায় পা'চারি করিত। আমরা ঐ বাসার সম্মুখ দিয়া গেলাম ; কিন্তু সে দিন আর জ্যোতিষবাবুকে দেখা গেল না। এই ভাবে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমরা ঢাকা ছাড়িয়া বিন্ধ্যাচলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কুঞ্জবাবু তখন সপরিবারে বিন্ধ্যাচলে। একদিন তাহার স্ত্রী, ছেলেপেলে ও ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া আমি বিন্ধ্যাচলের দেবমন্দির দেখিতে বাহির হইলাম। আমরা পাহাড়ের এক সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে ছিলাম। সিঁড়িটি ছিল খুব সরু। আমি সকলের আগে আগে যাইতেছিলাম। আমার পিছনে ভোলানাথ এবং তাঁহার পিছনে কুঞ্জবাবুর স্ত্রী ও ছেলেপেলেরা ছিল। আমি আনমনা ভাবে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে ছিলাম, কোথায় যে পা ফেলিতেছি তাহাতে লক্ষ্য নাই। পাহাড়ে গেলে আমার এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। এই ভাবে চলিতে চলিতে এক সাপের গায়ে পা দিলাম। ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ পা সরাইয়া অন্য সিঁড়িতে উঠিয়া দাড়াইলাম। পা তোলার সাথে সাথেই সাপটি আমার পায়ের নীচে কামড়াইয়া দিল এবং যেখানে ছিল সেইখানে থাকিয়াই ফণা তুলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমিও একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। এ দিকে "সাপ" "সাপ" বলিয়া সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সকলের দৃষ্টিই তখন সাপের উপর পড়িল। ভোলানাথ আমার ও সাপের পিছনে ছিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাপে আমাকে

কামড়াইয়াছে কিনা এবং সেটাকে তিনি মারিবেন কি না। আমি বলিলাম, "না মারিও না।" ভোলানাথ যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাপটিকে তিনি মারিবেন কি না তখন সাপটি মুখ ফিরাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল, পরে পাহাড়ের গা' বাহিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল। এই সময় কুঞ্জবাবুর ছোট ছেলে তাহার মাকে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "মা, দাদাকে যে সাপে কাটিবার কথা ছিল তাহা মা নিজে নিলেন।" এত ছোট ছেলে কেন এ কথা হঠাৎ বলিয়া উঠিল তাহা কে জানে ?

"ইহার পর নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা আবার বাসায় আসিলাম। এই দিন বাসায় আমাদের সকলের জন্য খিচুরী রান্না হইয়াছিল। আমি একাই সে সমস্ত খিচুরী খাইয়া ফেলিলাম। পরে আবার নূতন করিয়া খিচুরী রাঁধিয়া সকলকে খাইতে দিতে হইল। বিকাল বেলা খেয়ালের বশে কুঞ্জবাবুর ছেলেদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করিয়া পাহাড়ের নীচে চলিয়া আসিলাম। সেখানে বিশ্রাম করিতে করিতে ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলের নীচে সূচের আঘাতের চিহ্নের মত দুইটি নীল রংঙ্গের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সাপটি ছিল গোক্ষুর জাতের এবং উহার কামড়ের পর কিছুকাল বিষের ক্রিয়াও বুঝিতে ছিলাম। সন্ধ্যার পর যখন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম তখন আমি কুঞ্জবাবুর ছেলেকে ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে খাইল সাপে, আর আমি খাইলাম ভাত।'

"ইহার কিছুদিন পর আমরা শা'বাগে ফিরিয়া আসিলাম। একদিন বাউলবাবু প্রভৃতির নিকট এই সাপের গল্প বলিতে বলিতে সাপটা চলিয়া গেল বলিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিলাম এবং নিজকে আবার এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম যে উহার সঙ্গে আবার দেখা হইবে।

"এই ঘটনার পর আমরা একবার বিদ্যাকূটে যাই। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া যে দিন বাড়ী হইতে নৌকা করিয়া ষ্টেশনে রওনা হইব সেই দিন রওনা হওয়ার সময় আবার হঠাৎ আমার কান্না পাইতে লাগিল। প্রতিবেশী যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদের গলা ধরিয়া কান্দিতে লাগিলাম। মেয়েরা বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় যেরূপ কাঁদে ইহাও সেইরূপ কান্না। কি জন্য যে খালি কান্দিতেছি তাহা আমি নিজেই জানি না। ইহা যে মা বাবার জন্য নয় তাহা বলাই বাহুল্য; কারণ মা বাবা আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। যাহারা আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল তাহারাও আমার কান্না দেখিয়া কান্দিতে লাগিল। যাহা হউক আমরা নৌকায় আসিয়া উঠিলাম। আমার সঙ্গে মা, বাবা, শশাঙ্কবাবু, খুকুনী ও খুকুনীর দাদা * ছিল। আমরা যখন নৌকা করিয়া একটা বিলের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম তখন আমি দেখিতে পাইলাম যে, একটি সাপ ফণা তুলিয়া আমাদের

* শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি আগ্রা কলেজের একজন অধ্যাপক। এই গল্পটি একদিন ইঁহার মুখেও শুনিয়াছি।

নৌকার দিকে আসিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাপটি বরাবর দশ বার হাত মাত্র ব্যবধানে থাকিয়া চলন্ত নৌকার দিকেই আসিতেছিল, কখনও উহা নৌকার আগে বা পাছে পড়িতেছিল না। আমি একদৃষ্টে উহার দিকে তাকাইয়া ছিলাম, অন্য দিকে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। আমার এক দিকে খুকুনী ও অন্যদিকে খুকুনীর দাদা। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সাপটি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিল অথচ ইহাদের কাহারও দৃষ্টি এ দিকে পড়ে নাই। অবশেষে সাপটি যখন নৌকার নিকটে আসিয়া আমার মুখের কাছে ফণা তুলিয়া উঠিল তখন নৌকার মাঝি উহা লক্ষ্য করিয়া বৈঠা দিয়া সাপটিকে মারিতে গেল। বৈঠার আঘাত কিন্তু সাপের গায়ে লাগিল না। উহা চলিয়া গেল; কিন্তু বৈঠার আঘাতে এত জল আমার গায়ে ছিটিয়া আসিল যে, তাহাতে আমি প্রায় স্নান করিয়া উঠিলাম। সকলে আমাকে কাপড় ছাড়িয়া ফেলিতে বলিল। আমি বলিলাম, "না, এ জল গায়ে শুকান ভাল।" তখন উহারা এই বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল যে, উহাদিগকে বলিতে হইবে ঐ সাপটি কে। আমি বলিলাম, "এটি বিন্ধ্যাচলের সাপ, ইনি একজন মহাপুরুষ, শিষ্য সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন।"

এই সময় আমি বলিলাম, "মা, তুমি না একটি সাপের কথা বলিলে? শিষ্য আসিল কোথা হইতে?" মা বলিলেন, "ঐ মহাপুরুষের পশ্চাতে একজন শিষ্য দেখিয়াছিলাম। মহাপুরুষগণ শিষ্য ছাড়া আসেন না।

তাঁহারা জন্মিবার সময় শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। তবে তোমার সন্দেহ হইতে পারে যে, বিন্ধ্যাচলের সাপ বিত্থাকূটে আসিল কি প্রকারে।" আমি বলিলাম, "না, ওদিকে আমার কোন সন্দেহ নাই। তবে সাপটি যদি মহাপুরুষই হ'ন তবে তোমাকে কামড়াইয়াছিলেন কেন?" মা উত্তর করিলেন, "কামড়াইয়াছিল কোথায়? তোমরা ছেলেপেলের পা ধরিয়া আদর কর না? ইহাও সেইরূপ। আমি আতুরে মেয়ে কি না তাই বাবা আমার পা ধরিয়া আদর করিয়া গিয়াছিল। সেই হইতেই বাবাজী আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।" "আমি তখন বলিলাম, "মা, যে সমাধির * উপর তুমি শিব মন্দির তৈয়ার করিয়াছ উহা ত এই মহাপুরুষের সমাধি নয়? তাহা না হইলে হঠাৎ সে দিন তুমি মন্দিরের চূড়ার উপরে একটি সাপ তৈয়ার করিয়া দিতে বলিলে কেন?" ইহা শুনিয়া মা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "আমি এত কথা বলিতে পারি না।"

মা বলিতে লাগিলেন, "আর একদিন নিরঞ্জন বাবুর † বাসায় কীর্ত্তন হইতেছিল। আমি দোতালার উপর একটি কোঠায়

---

* রমনার আশ্রমে অন্নপূর্ণার মন্দিরের পশ্চাতে একটি ছোট বাঁধান জায়গা ছিল। আমি প্রথমে আশ্রমে যাইয়া উহা ঐ অবস্থাতেই দেখিতে পাই এবং অন্যান্য ভক্তদের নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারি যে, উহা একজন মহাপুরুষের সমাধি বলিয়া উহা ঐরূপ বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। পরে মা উহার উপর একটি শিবমন্দির স্থাপন করেন এবং মন্দিরের চূড়ার চতুর্দ্দিকে একটি সর্প তৈয়ার করিয়া দিতে বলেন।

† ইনি ৺জ্যোতিষবাবুর বন্ধু। নাম ৺নিরঞ্জন রায়। ইনি ইন্‌কাম ট্যাক্সের সহকারী কমিশনার ছিলেন। দুই বন্ধুই মা'র বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন।

শুইয়া ছিলাম। উহারা আমাকে কীর্ত্তনের নিকট যাইবার জন্য ডাকিতে আসিল; কিন্তু তখন আমার কেমন এক ভাব হইয়াছিল যে, আমি আর উঠিয়া যাইতে পারিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ পর "সাপ" "সাপ" বলিয়া এক রোল উঠিল। ঐ শব্দ শুনিয়া আমি নীচে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। লোকেরা এ ঘরে ও ঘরে সাপ খুজিতে লাগিল। আমি টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছি এমন সময় সাপের গায়ে আমার পা পড়িল। সাপটা পালাইবার জন্য আমার পায়ের আঙ্গুলের নীচে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। ভোলানাথ আমার পশ্চাতে ছিলেন। আমি ভোলানাথকে সরাইয়া দিয়া সাপের গা হইতে পা উঠাইলাম। সাপটি তখন সিঁড়ির নীচে যাইয়া লম্বা ভাবে পড়িয়া রহিল। উহা দেখিতে সরু ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। উহাকে মারিতে কেহ কেহ আমার অনুমতি চাহিল। আমি বলিলাম, "যদি সামর্থ্য থাকে তবে মার।" তাহারা লাঠি দিয়া সাপের গায়ে আঘাত করিতে গেল, কিন্তু ইহার মধ্যে সাপটি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা টের পাওয়া গেল না। বাড়ী ভরা আলো এবং এত লোকজন, ইহার মধ্য হইতে কি করিয়া যে সাপটি অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা কেহই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।"

আর একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, রমণায় তুমি যে স্থানে আশ্রম করিয়াছ ঐ স্থানে নাকি তুমি সাপকে মাঝে মাঝে দুধকলা খাওয়াইতে?" মা বলিলেন, "দুধকলা সাপকে এখনও দেওয়া হয়।

আশ্রম স্থাপনের পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং উহার মধ্যে শিয়াল, সাপ প্রভৃতি নানা জন্তু থাকিত। এখানে ছোট একটি ভাঙ্গা দেবালয়ও ছিল। জানইত আমি নিজে কিছু করি না। একদিন হঠাৎ খেয়াল হইল যে, এই স্থানে দুধকলা দিয়া যাই। রাত্রিতে আসিয়া আমরা দুধকলা দিয়া গেলাম। সাত দিন পর হঠাৎ আবার এক রাত্রিতে খেয়াল হইল যে, দেখিয়া আসি ঐ দুধকলা কি হইল? ভোলানাথ ও আরও কয়েক জনকে সঙ্গে করিয়া লণ্ঠন লইয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি যে, যে ভাবে দুধকলা রাখিয়া গিয়াছি উহা ঠিক সেই ভাবেই আছে। জঙ্গলে এত জীবজন্তু ছিল কেহই উহা স্পর্শ করে নাই; এমন কি একটা খড়কুটাও উহার উপর পড়ে নাই। দুধ দেখিয়া মনে হইল যে, এতদিন যেন ইহা ঢাক্‌নীর নীচে ছিল এবং এই মাত্র ঢাক্‌নী উঠান হইয়াছে। এই দুধ দেখিয়া আমি বলিলাম, 'এস, আমরা সকলে প্রসাদ পাই।' কিন্তু সাথের লোকেরা আপত্তি করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "এ দুধ না খাওয়াই ভাল, যদি ইহার মধ্যে কোনও বিষ থাকে তবে যে খাইবে সেই মরিবে।" আমি বলিলাম 'দুধ আমিই প্রথম খাইব।' এই বলিয়া হাতের মধ্যে একটু দুধ লইয়া খাইলাম, তারপর সকলেই একটু একটু খাইল। বাকী দুধটুকু রাখিয়া গেলাম। পরদিন সকাল বেলা আসিয়া দেখি যে, কে যেন ঐ দুধ একেবারে নিঃশেষ করিয়া খাইয়া গিয়াছে। মনে হইল এতদিন যেন

আমাদের জন্যই উহারা অপেক্ষা করিতেছিল।" ঐ স্থানটি পরে বন্দোবস্ত লইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আশ্রম স্থাপন করা হইয়াছে। এ স্থানটির প্রশংসা মা অনেকবার করিয়াছেন। একদিন বলিয়াছিলেন, "এখানে এত যজ্ঞাদি হইয়াছে যে, এখানে অপবিত্র কিছু নাই। এখানকার ধূলিকণাগুলিও পবিত্র।" আর একদিন বলিয়াছিলেন, "এখানে পূর্ব্বে যে সব মহাপুরুষেরা সাধনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের বাসনাতেই এই আশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে।" ভক্তদিগকে মা সর্ব্বদাই আশ্রমে আসিয়া নাম জপাদি করিতে উপদেশ দেন।

(২)

মা যখন শা'বাগ এবং সিদ্ধেশ্বরীআশ্রমে বাস করিতেন তখন অনেকেই মা'র অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু আমি যে সময় হইতে মা'র নিকট যাতায়াত আরম্ভ করি তখন মা সমস্ত বিভূতি সংবরণ করিয়া স্থির ধীর প্রশান্ত মহোদধির ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমি মা'র কোন বিভূতি দর্শন করি নাই। ইতিপূর্ব্বে মা'র মুখ হইতে ভাবাবেশে সংস্কৃত স্তোত্র বাহির হইতে অনেকেই শুনিয়াছেন। মা নিজেই হাসিতে হাসিতে ঐ স্তোত্রের কথা আমার নিকট উল্লেখ করিতেন। মা বলিতেন, "এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, এই সব স্তোত্র মুখ হইতে বাহির হইবার সময় যে শব্দ যে ভাবে উচ্চারণ হওয়া দরকার জিহ্বাটি আপনা হইতেই ঠিক জায়গায় যাইয়া সে শব্দ সেইভাবে উচ্চারণ করাইয়া দিত।" এই সব কথা শুনিয়া আমি একদিন বলিয়াছিলাম, "মা, তোমার মুখে সংস্কৃত স্তোত্র শুনিতে আমার বড় সাধ হয়।" মা

বলিলেন, "আমিত ইচ্ছা করিয়া ঐ সব স্তোত্র বলিতে পারি না। কখন কখন উহা আপনা আপনি আমার মুখ হইতে বাহির হয়। উহার উপর আমার কোন হাত নাই।"

আর একদিন মাকে বলিলাম, "মা, তুমি নাকি তোমার কোন কোন ভক্তকে দশমহাবিদ্যারূপ দেখাইয়াছ?" মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি কিছুই দেখাই নাই। উহারা বলে যে, উহারা নাকি দেখিয়াছে।" স্পর্শ করিয়া রোগাদি আরোগ্য করার কথা জিজ্ঞাসা করিলেও মা ঐরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এ সব কিছুই আমার ইচ্ছায় হয় না। সমস্তই ভগবানের ইচ্ছায় হয়। এমন দেখিয়াছি যে, কোন রোগী আমার কাছে আসিলে আপনা হইতেই আমার হাতটি তাহার গা স্পর্শ করিত এবং তাহার ব্যারামও সারিয়া যাইত। আবার কোন কোন রোগী আসিলে তাহাদিগের গায়ে হাত দিতে কিছুতেই আমার ইচ্ছা হইত না। শা'বাগে থাকার সময় একবার একটি রোগীকে আমার কাছে লইয়া আসা হইল এবং তাহাকে ভাল করিয়া দিবার জন্য আমাকে খুব অনুরোধ করা হইল। আমি বলিলাম, "আমার এমন কোন শক্তি নাই যাহা দিয়া আমি রোগ সারাইতে পারি। তোমরা ডাক্তার কবিরাজের নিকট যাও।" কিন্তু ভোলানাথ খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'ইহাকে তোমার সারাইয়া দিতেই হইবে নচেৎ আমি তোমাকে ছাড়িব না।' এই বলিয়া তিনি রোগীকে শা'বাগে স্থান দিলেন। আমি তখন আর কিছু বলিলাম

না। বৈকাল বেলা কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। আমি ভাবাবেশে বলিলাম, 'রোগীকে আসিয়া কীর্ত্তনস্থানে গড়াগড়ি দিতে বল।' রোগী কীর্ত্তনের স্থানে আসিল ; কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তথায় গড়াগড়ি দিতে পারিল না। অথচ সে এত দুর্ব্বলও ছিল না যে, সে এই কাজটুকু নিজে করিতে পারিত না। কেন না সে পায়ে হাটিয়াই আশ্রমে আসিয়াছিল। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, তাহার সাথীরাও কেহ তাহাকে জোর করিয়া ঐ স্থানে সোয়াইয়া দিল না। পরে শুনিলাম রোগীটি বাড়ী ফিরিবার পথেই মারা গিয়াছে। সেইজন্য বলি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কিছুই হয় না।"

আর একদিন,—সে দিন বোধ হয় শিবচতুর্দ্দশী ছিল,—আমি সকাল বেলাই আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সেখানে অন্যান্য ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর মা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, তুমি লোকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার স্বভাব এবং মনের ভাব বলিতে পার কি না ?" মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি ওসব পারি না।" উত্তরটা আমার মনোমত হইল না। আমি আবার বলিলাম, "মা, আমি শুনিয়াছি যে, যোগীরা মুখ দেখিয়া, এমন কি কোন ব্যক্তির ব্যবহার করা জিনিষ দেখিয়া বা ছুইয়া সেই লোকের চেহারা, স্বভাব এবং সে কোথায়, কি ভাবে আছে সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন।" মা বলিলেন, "উহা আমিও পারি। তবে, দেখ, এতগুলি লোকের নিকট আমি যদি তোমার স্বভাবের কথা বলিতে আরম্ভ করি তবে তুমি লজ্জা

পাইবে।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি ত তোমাকে আমার স্বভাবের কথা বলিতে বলিতেছি না, তুমি এ সব বলিতে পার কি না কেবল তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তুমি প্রথমে ইহা অস্বীকার করিলে কেন?" মা শুধু হাসিলেন, আর কিছু বলিলেন না।

এই দিন একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয় যাহাতে মা'র কিছু অলৌকিক বা ঐরূপ কোন শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। বেলা তখন প্রায় ১১টা কি ১১॥ টা হইবে। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। এমন সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিবচতুর্দ্দশী বলিয়া ইহারা দেবালয়ে দেবালয়ে ঠাকুরাদি দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা মন্দিরের বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মা'র নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সংখ্যায় তাহারা ১৫।২০ জন হইবে। হঠাৎ একটি স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার কানের মাক্‌ড়ি দুইটি ত বড় সুন্দর; আজকাল এইরূপ মাক্‌ড়ি লোকে পরে নাকি?" মা বার বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। মা যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছিলেন তাহার দিকে তখন পর্য্যন্ত আমি একবারও তাকাই নাই, বা তাকাইয়া দেখা দরকার মনে করি নাই। আমি কেবল মা'র হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কৌতুক করিবার ভঙ্গি দেখিতেছিলাম। মা'র হাবভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল এ যেন একটি অবোধ বালিকা। অতি সামান্য বিষয় লইয়াই আনন্দে বিভোর! এমন সময় মা স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার চোখ দুইটি ত বড় সুন্দর! তোমার কানের দুলের কথা বলাতেই ত এমন সুন্দর চোখ দুইটি দেখিতে পাইলাম।" এই কথা শুনিয়া আমার বড়

কৌতুহল হইল। আমিও সেই স্ত্রীলোকটির পানে তাকাইলাম। তাকাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষু স্থির। স্ত্রীলোকটির বয়স ৩০।৩৫ বৎসর হইবে। গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মুখ মোটেই সুন্দর নয়। চক্ষু দু'টি বড় ও রক্তবর্ণ এবং অস্বাভাবিক রূপে বিস্ফারিত। বিভীষিকা দর্শন করিলে লোক যেরূপ ভয়াকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, এ দৃষ্টিও সেইরূপ। স্ত্রীলোকটি মা'র দিকে চাহিয়া চাহিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। আমি খুব ভীত হইয়াছিলাম, কি যে কর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন। মা'র দিকে তাকাইয়া দেখি যে, তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে লুটাপুটি যাইতেছেন। এক সময়ে দুইটি বিসদৃশ দৃশ্য দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম। মা'র এই অস্বাভাবিক আনন্দেরও কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। তখন মনে হইল যে, স্ত্রীলোকটির এ অবস্থা হইবার হেতু বোধ হয় মা; কারণ সে যে ভাবে মা'র দিকে তাকাইয়াছিল তাহাতে মনে হইয়াছিল যে, সে নিশ্চয়ই মার ভিতর কিছু দর্শন করিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। আর মা যখন এত হাসিতেছেন তখন নিশ্চয়ই ভয়ের কোন কারণ নাই। মা কি এমন নিষ্ঠুর যে, স্ত্রীলোকটির যদি প্রাণের আশঙ্কা থাকিবে তবে এমন মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার এই ভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন? এদিকে ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গিনীরা তাহাকে নিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। মা হঠাৎ হাসি বন্ধ করিয়া বলিলেন, "এ যখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে তখন ইহাকে আশ্রমে রাখিয়া তোমরা চলিয়া যাও, পরে ভাল হইয়া এ চলিয়া যাইবে।" এ কথা তাহাদের মনঃপূত হইল না। সঙ্গিনীদের ভাবে বুঝিলাম যে, এ ব্যাপারের জন্য তাহারাও মাকেই দায়ী করিতেছে এবং একটা বিরক্তির ভাবও তাহাদের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উহাদের মধ্যে

একজন বলিল যে, ঐ স্ত্রীলোকটি মাঝে মাঝে এইরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। মা বলিলেন, "বেশ ত, এর যদি এইরূপ কোন ব্যারাম থাকে তবে ইহাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতে তোমাদের আপত্তি কি ?" এই সব বাক্যালাপের মধ্যেই স্ত্রীলোকটি সচেতন হইয়া উঠিল এবং সে তাহার একজন সঙ্গিনীকে ভর করিয়া ধীরে ধীরে আশ্রম হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু সে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে না যাওয়া পর্য্যন্ত বিস্ফারিত ও অনিমেষ লোচনে মা'র দিকে তাকাইতে তাকাইতে গিয়াছিল। স্ত্রীলোকগুলি চলিয়া গেলে ভক্তদের মধ্যে একজন—প্রমথ বাবু *—বলিলেন, "মা, তুমিই এই কর্ম্ম করিয়াছ।" মা বলিলেন, "আমি কি করিলাম ? আমি ত কেবল উহার চোখের প্রশংসা করিয়াছি। তুমি কি শুনিলে না যে, উহার সাথীরা বলাবলি করিল যে, মাঝে মাঝে উহার এইরূপ হইয়া থাকে ?"

স্ত্রীলোকটিকে মা সত্য সত্যই অজ্ঞান করিলেন কি স্ত্রীলোকটির হিষ্টীরিয়া জাতীয় কোন রোগের জন্য এইরূপ হইল তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। তবে ইহাও অনুধাবন করিবার বিষয় যে, এতগুলি স্ত্রীলোকের মধ্যে কেমন করিয়া মা ইহাকে বাছাই করিয়া নিলেন। বিশেষত্ব তাহার কিছুই ছিল না। কানের যে দুলের কথা লইয়া এই ব্যাপার হইল তাহারও বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না। ঐরূপ দুল পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোকেরা অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে এই ঘটনার একটু পূর্ব্বে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি লোকের আকৃতি দেখিয়া তাহার স্বভাব জানিতে পারেন কি না।

* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু। ইনি ঢাকাতে ওকালতি করেন এবং মা'র একজন পুরাতন ভক্ত।

কে জানে এই ব্যাপার ঘটাইয়া মা তাঁহার শক্তির একটু আভাস দিলেন কি না ?

যদিও যোগ-বিভূতি বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি তাহা আমি নিজে মা'র মধ্যে প্রত্যক্ষ করি নাই। তথাপি একটা বিষয় সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে যে চিন্তাটি জাগিয়া উঠিয়াছে মা অমনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন। বোধ হয় অন্যান্য ভক্তদেরও আমার মত অভিজ্ঞতা আছে।

আশ্রমে ভক্তরা "মা" "মা" এই নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি যখন আশ্রমে যাতায়াত আরম্ভ করি তখন প্রত্যেক শনিবার সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে "মা" "মা" বলিয়া একজন না একজন ভক্ত নাম রক্ষা করিতেন। এখনও ঐ ভাবে নাম রক্ষা করা হয়, তবে সময় পরিবর্ত্তন করিয়া সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। "মা" কোন দেবদেবীর নাম নয় এবং ইতিপূর্ব্বে আমি "মা" নামে কোন কীর্ত্তনও শ্রবণ করি নাই। কাজেই ভক্তরা যখন অবিরত "মা" "মা" বলিয়া চীৎকার করিতেন তখন আমার বড় হাসি পাইত ; কারণ আমি কানে শুনিতাম যে, তাঁহারা বিড়ালের মত যেন "ম্যাঁও" ম্যাঁও" করিতেছেন। কিন্তু কাহার নিকট আমার এই ভাব আমি প্রকাশ করি নাই। আর উহা প্রকাশ করিবার যোগ্য একটি কথাও নয় ; বরং আমার হীন রুচির ইহা একটা লক্ষণ মাত্র। একদিন সকাল বেলা আমি আশ্রমে গিয়াছি। যাইয়া দেখি একজন ভক্ত "মা" "মা" কীর্ত্তন করিতেছেন। মা'র নিকট আর কেহ নাই। আমি প্রণাম করিয়া মা'র নিকট বসিয়া ঐ কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলাম। মা হঠাৎ আমাকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, তোমার নামের

সঙ্গে এদের (অর্থাৎ আশ্রমবাসী ভক্তদের) নাম মিলে না বলিয়া অশ্রদ্ধা করিও না ; কারণ সমস্তই ভগবানের নাম। যে কোন নাম ধরিয়া ডাকিলে তাঁহাকেই ডাকা হয়।” মা আমার মনের গলদটুকু ধরিয়াছেন দেখিয়া লজ্জিত হইলাম। মাও অন্য কথা আরম্ভ করিলেন।

একবার আমার স্ত্রী মাকে একখানা তসরের শাড়ী দিয়া প্রণাম করেন। ইচ্ছা যে, মা কাপড়খানি অন্ততঃ একদিন ব্যবহার করেন। কিন্তু দেখা গেল মা কাপড়খানি স্পর্শও করিলেন না। খুকুনী দিদি কাপড়খানা উঠাইয়া রাখিলেন এবং উহার পরিবর্ত্তে মা'র ব্যবহৃত একখানা নূতন কাপড় দিলেন। আমাদের প্রদত্ত কাপড়খানা মা স্পর্শ করিলেন না দেখিয়া মনে যে একটু দুঃখ হইল না এরূপ নহে। কিন্তু কি করা যায়? ইহার ২।৩ মাস পর মা'র জন্মোৎসব আরম্ভ হইল। তখন সকলেই মাকে কাপড় দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় ঢাকার উকিল ৺বিভূচরণ গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের স্ত্রী মাকে একখানি লাল রংএর কাপড় আনিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি সকলের মত দিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না ; মাকে সেই কাপড় পরাইলেন। স্বভাবতঃই মা দেখিতে দেবীর মত, তাহাতে আবার রক্তাম্বরা হওয়াতে তিনি সাক্ষাৎ ভগবতীর মত দেখাইতে লাগিলেন। মা যে স্থানে ঐ লাল কাপড়খানি পরিধান করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে এক কোনে আমার স্ত্রীও বসিয়াছিলেন। রক্তবসনা মাকে দেখিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, “আহা! যিনি মাকে এই কাপড়খানি দিয়াছেন তিনিই ধন্য ; কারণ মা তাঁহার কাপড়খানি পরিয়াছেন। আমার কাপড়খানি ত মা স্পর্শও করেন নাই।” এই চিন্তা যেই মনে উদিত হওয়া আর মা অমনি তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,

"তোমার কাপড়খানাও পরিয়াছিলাম, তারপর যাহার ভাগ্যে ছিল তাহাকে দিয়াছি।" ইহা শুনিয়া আমার স্ত্রী লজ্জিত ও অবাক্ হইয়া রহিলেন।

১৩৩৯ সনে মায়ের জন্মোৎসবের সময় খুব ধূমধাম করিয়া ৺অন্নপূর্ণার পূজা করা হয়। একশত আট প্রকার ব্যঞ্জন দ্বারা অন্নপূর্ণার ভোগ হয়। এই ভোগ উপলক্ষ্যে দুই চারিজন ভক্তের উপর কিছু কিছু ভোগের সামগ্রী প্রদানের আদেশ হয়। আদেশ অবশ্য মা'র ইচ্ছানুযায়ী বাবা ভোলানাথের মারফতে হইয়াছিল। যাহাদের উপর এই আদেশ দেওয়া হয় তাহাদিগকে বিষয়টি গোপন রাখিতে বলা হয়। কিন্তু কথাটি গোপন থাকে না। ৺অন্নপূর্ণাপূজার পর দুই একজনের নিকট আমি এই আদেশের কথা শুনিতে পাই। সকলের কথা অবশ্য জানি না; কিন্তু দেখিলাম যে, যে দুই ব্যক্তির উপর ভোগদ্রব্য প্রদানের আদেশ হইয়াছে তাঁহারা উভয়েই সরল প্রকৃতি, সচ্চরিত্র এবং ধর্ম্মপ্রাণ। মনে করিলাম মা উপযুক্ত লোকের নিকটই দেবীসেবার দ্রব্যসম্ভার চাহিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর ধিক্কার আসিল। মনে হইল আমি অশুদ্ধচিত্ত ও ভক্তিহীন বলিয়াই বোধ হয় মা আমাকে কোন আদেশ করিলেন না। কিন্তু মনের কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলাম না। যাহা হউক উৎসবান্তে যে দিন কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম সেদিন আশ্রমে মাকে প্রণাম করিতে গেলাম। মা আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "বাবাজীকে বলিও কলিকাতা হইতে কিছু ভাল চন্দন আনিয়া মন্দিরে পূজার জন্য যেন দেয়।" স্ত্রীর নিকট এই কথা শুনিয়া আমি তখনই বুঝিতে পারিলাম যে, এ আদেশের অর্থ কি। দেবীপূজায় আমি কিছু দিতে পারি নাই বলিয়া যে আমার মনে কষ্ট হইয়াছিল মা এই আদেশদ্বারা তাহাই

অপনোদন করিলেন। আমি মনে মনে ভক্তিভাবে মাকে শত শত প্রণাম করিতে করিতে গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম। দুই মাস পর যখন চন্দন আনিয়া আশ্রমে দিলাম তখন দেখিলাম যে, আশ্রমে চন্দনের অভাব হয় নাই।

আর একদিন সকাল বেলা সিদ্ধেশ্বরী-আশ্রমের দিকে রওনা হইয়াছি, উদ্দেশ্য ঐখানে মা'র সঙ্গে দেখা করা এবং তাঁহার নিকট বসিয়া কিছুক্ষণ ভগবানের নাম করা। পথে যাইতে যাইতে গণেশবাবুর * সঙ্গে দেখা হইল। তিনিও সিদ্ধেশ্বরী-আশ্রমাভিমুখে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলাম যে, যে উদ্দেশ্য লইয়া মা'র কাছে যাইতেছি তাহা বোধ হয় সফল হইবে না; কারণ আমি একা থাকিলে মা হয়ত কোন কথা বলিতেন না। কেন না, প্রশ্ন না করিলে মা কদাচিৎ কথা বলেন। কিন্তু গণেশ বাবু নীরব থাকিবার পাত্র ন'ন। তিনি মাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। যাহা হউক আমরা সিদ্ধেশ্বরীআশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলাম। মাকে প্রণাম করিয়া যেই আমরা আসন গ্রহণ করিয়াছি অমনি মা বলিয়া উঠিলেন, "বাবাজী, তোমরা একটু বস, আমি একটু ঘুমাইয়া লই।" এই বলিয়া মা শুইয়া পড়িলেন। খুকুনী দিদি মাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। ঘরটির মধ্যে আমরা চারিজন, কিন্তু সকলেই নীরব। শশাঙ্কবাবু ধ্যানে মগ্ন, মা নিদ্রার ভান বা চেষ্টা করিতেছেন, খুকুনী দিদি মাকে বাতাস করিতে করিতে ঝিমাইতে লাগিলেন। গৃহের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া

---

* শ্রীযুত গণেশচন্দ্র সেন, বি. এ, বি. টি. ইনি ঢাকা নবকুমার স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

আমার বা গণেশ বাবুর কথা বলার সাহস হইল না। কাজেই আমরা মনে মনে নাম করিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বেলা বাড়িয়া উঠিল। তখন আমি বাড়ী ফিরিবার জন্য একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। এদিকে মা আমাদিগকে বসিতে বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাকে না বলিয়াই বা আসি কিরূপে? যেই মাত্র এই সব চিন্তা আরম্ভ করিয়াছি অমনি মা উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "বাবাজী, বেলা হইয়াছে এখন বাড়ী যাইবে না?" আমরা আর কোন কথা না বলিয়া মাকে প্রণাম করিয়া রওনা হইলাম। পথে মনে মনে বলিতে লাগিলাম, "মা আমার অন্তর্যামিনী, মুখে তাঁহাকে কিছু বলিতে হয় না, মনে মনে প্রার্থনা করিলেই তিনি জানিতে পারেন।" এইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও অনেক ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যাহা হইতে মনে হয় মা আমাদের গুহ্যাতিগুহ্য চিন্তাও সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারেন।

(৩)

পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে কলেজের কাজ শেষ করিয়া মা'র নিকট একা যাইতাম; পরে আবার বৈকাল বেলা সপরিবারে যাইতাম। কথাবার্ত্তা যাহা হইত তাহা সকাল বেলাতেই হইত। আর প্রত্যহই যে কথাবার্ত্তা হইত এমত নহে। প্রথম প্রথম মাকে নানা প্রশ্নই করিতাম এবং উহার কোন ধারা ছিল না। পরে আপনা হইতেই প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা চলিয়া গেল। এক এক দিন হয়ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়াই চলিয়া আসিতাম।

একদিন সকাল বেলা আশ্রমে যাইয়া দেখি মা তাঁহার কুটীরের উত্তর দিকের বারান্দায় একা বসিয়া আছেন। আমি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মাও কোন কথা না বলিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া

রহিলেন। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল; পরে মা আপনা হইতেই প্রশ্ন করিলেন "বাবাজী, আম গাছ হইতে মধু পড়িতে দেখিয়াছ ?" আমি বলিলাম "হা, মা, দেখিয়াছি। কিন্তু উহা পড়ে কেন ?" মা সাধারণ ভাবেই উত্তর দিলেন, "আম গাছে মুকুল হয়। ঐ মুকুলে মধু থাকে, বোধ হয় উহা হইতেই মধু পড়ে।" আমি ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের গেণ্ডারিয়া আশ্রমের এক আম গাছ হইতে মধুবর্ষণের কথা উল্লেখ করিলাম। গোস্বামী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, যদি কোন বৃক্ষের নীচে কোন সাধু দীর্ঘকাল সাধন ভজন করেন তবে উহার প্রভাবে ঐ বৃক্ষ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া যায় এবং ঐ সব সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন বৃক্ষ হইতে মধুবর্ষণ হইতে থাকে। মা বলিলেন, "উহা অসম্ভব নয়, কারণ গাছেরও প্রাণ আছে। মানুষের চরিত্র যদি সৎসংসর্গে উন্নত হয় তবে গাছেরই বা হইবে না কেন ?" পরে মা তাঁহার কুটীরের উত্তর দিকে একটি আম গাছ দেখাইয়া বলিলেন যে, ঐ গাছ হইতে একবার বৃষ্টির ফোটার মত টপ্ টপ্ করিয়া মধু পড়িয়াছিল। গাছের নীচে একটি থালা রাখিয়া কিছু মধু সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন যে, দুপ্রহর রাত্রি সাধনভজনের নাকি একটি প্রকৃষ্ট সময়, কারণ মহাপুরুষগণ তখন গমনাগমন করিতে থাকেন এবং কোন ভক্তকে জপতপ করিতে দেখিলে আসিয়া সাহায্য করিয়া যান।" মা এ কথা অস্বীকার করিলেন না, তবে তিনি যাহা বলিলেন তাহার ভাব কতকটা এইরূপ—প্রত্যেক সময়েরই একটা বিশেষ ভাব আছে এবং এই ভাবগুলি পাত্রভেদে কাজ করিয়া থাকে। যেমন সকাল বেলায় এক ভাব এবং সন্ধ্যা বেলায় অন্য

এক ভাব। সন্ধ্যাবেলা সাধারণতঃ মনটা শূন্য থাকে এবং অনেকটা স্থির হইয়া আসে। কাজেই এই সময় নামজপ করা বিধেয়। সেইরূপ মধ্যরাত্রের একটি বিশেষ ভাব আছে যাহা সাধন ভজনের অনুকূল। ইহা ব্যতীত এই ভাব গুলির আবির্ভাবও অনুভব করা যায়। বিশেষ গন্ধ বা নামে বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি হইতেও মহাপুরুষদের সান্নিধ্য বা তাঁহাদের সাধু প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় এরূপও হয় যে, সাধক যখন ছেলেপেলে সহ নিদ্রা যায় তখন মহাপুরুষদের আবির্ভাবে ছেলেপেলে হঠাৎ চমকিয়া উঠে। তবে সাধকের ভয়ের কোন কারণ নাই, যেহেতু সাধকের ভীত হইবার মত অবস্থা থাকিলে ঐ সব মহাপুরুষেরা দেখা দেন না। জগতের বিধান এমনই সুন্দর যে, ভগবানের কৃপাভাণ্ড সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে, পাত্রানুসারে ঐ কৃপা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যাহার যেমন অধিকার সে ততটুকু গ্রহণ করে।

মাকে আবার প্রশ্ন করিলাম, "মা, আমার গুরুদেব সময় সময় শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন যে, মালাজপ করাও একরূপ বন্ধন। সাধনরাজ্যে কোনরূপ বন্ধনের মধ্যে যাইতে নাই। কিন্তু মালাজপ যে কি অর্থে বন্ধন তাহা বুঝিতে পারি না।" মা বলিলেন, ঐ উপদেশ সকলের জন্য নয়। অধিকারিভেদে উপদেশ ভিন্ন হইয়া থাকে। মালা একবার জপ আরম্ভ করিলে উহাকে কখনও উপবাসী রাখা চলে না অর্থাৎ প্রত্যহই মালাজপ করিতে হয়। এই অর্থে মালা একরূপ বন্ধন।" মা আরও বলিলেন, "তুমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া আজ মালার প্রশ্ন করিলে গতকল্য বৈকাল বেলা ঠিক ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া অন্য একটি লোক এই মালার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ইহাতে

মনে হয় স্থানের কিছু মাহাত্ম্য আছে।” এই বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং মালা সম্বন্ধে একটি গল্পও বলিলেন।

মা বলিলেন, “একবার আমি নবদ্বীপে গিয়াছিলাম। সেখানে যতীশ বাবু * আমাকে একটি তুলসীর মালা শোধন করিয়া দিতে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, ‘আমি ওসব কিছু জানি না।’ তাহাতে সে বলিল “আচ্ছা, শোধন যদি নাই কর, তবে অন্ততঃ মালাটি একবার স্পর্শ করিয়া দাও।” আমি মালাটি হাতে লইলাম। অমনি আমার মনে হইল যে, মালাটি বোধ হয় তুলসীর নয়। কিন্তু আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিলাম না। ইহার পর আমরা পুরী যাই। সেখানে ভোলানাথ বাজার হইতে চন্দনের মালা ক্রয় করিয়া আনিলে, উহার একটি মালা আমাকে স্পর্শ করিয়া দিতে বলায় আমি যেই মালাটি হাতে লইলাম তখন আবার আমার পূর্ব্বের সন্দেহ মনে আসিল ; অথচ মালা হইতে চন্দনের সুগন্ধ বাহির হইতেছিল। তখন সন্দেহ দূর করিবার জন্য ঐ মালাটির সূতা ছিড়িয়া প্রত্যেকটি ঘুটি বাহির করিয়া দেখিলাম যে, মালাটি সামান্য কাঠের মালা, কেবল চন্দন মাখান ; ইহার পর কাশী হইতে বিন্ধ্যাচলে যাই। সেখানে ঢাকা দোলাইগঞ্জ-আশ্রমের ত্রিপুরলিঙ্গ বাবাজীর এক শিষ্য আমাকে একটি খাঁটি তুলসীর মালা দেয়। সে বলে যে, সে নিজে

---

* শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গুহ। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন উকিল এবং মায়ের একজন পুরাতন ভক্ত।

একটি শুক্‌না তুলসী গাছ হইতে এ মালা তৈয়ার করিয়াছে। কিন্তু সে সন্ন্যাসী তাহার তুলসীর মালার প্রয়োজন নাই। তাই সে মালাটি আমাকে দান করিল। তখন আমি ঐ মালাটি যতীশকে দিলাম। কারণ তাহার মালা স্পর্শ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, উহা তুলসীর মালা নয়। কিন্তু সে সরল বিশ্বাসে তুলসীর মালা বলিয়াই উহা জপ করিয়া যাইবে; তাই ভগবান্ তাহাকে একটি খাঁটি তুলসীর মালা জুটাইয়া দিলেন।”

আমি বলিলাম “এখন দেখিতেছি তোমাকে দিয়া জিনিষ ছোঁয়াইয়া নিলে খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায়। মা হাসিয়া বলিলেন, “এগুলি সরল বিশ্বাসের পুরস্কার। দীক্ষা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। ছেলেপেলে যখন কোন নূতন জিনিষের জন্য আবদার করে, মা তাহাকে ভুলাইতে যে কোন জিনিষ হাতে দিয়া মিথ্যাকথা বলিয়া সান্ত্বনা দেন। ছেলেটি যাহা চাহিয়াছিল তাহাই পাইল মনে করিয়া আনন্দ করিতে থাকে। মা কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হ’ন না। পরে যখন আসল জিনিষটি হাতের কাছে পান, তখনই তাহাকে উহা দিয়া নিশ্চিন্ত হ’ন। সেইরূপ লোকে সরল বিশ্বাসে যে কোন মন্ত্র জপ করিতে থাকিলেই ভগবান্ নিজেই ভক্তকে খাঁটি মন্ত্র দিবার ব্যবস্থা করিয়া সরল বিশ্বাসের পুরস্কার দিয়া থাকেন।”

আর একদিন মাকে বলিলাম, “মা, আমরা সংসারী, আমরা যদি ভগবান্, ভগবান্ করিয়া সমস্ত সাংসারিক কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসি তবে আমাদের সংসার চলিবে কিরূপে? চাকুরীই বা কে করিবে?

ছেলেপেলে-প্রতিপালনই বা কে করিবে ?" মা বলিলেন, "সব তিনি করেন। দেখ, যখন আমি বাজিতপুরে ছিলাম তখন হইতেই আমার কি যে এক অবস্থা হইল যে, আমি নিজে কোন কাজ করিতে পারিতাম না। অথচ সংসারে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। বার বৎসর বয়সের এক ঠিকা ঝি ছিল সে আমার সমস্ত কাজই করিয়া দিত। সে অন্য বাসায়ও ঠিকা কাজ করিত। আমাদের বাসায় বেশী কাজ করে পাছে ইহা অন্যলোক জানিতে পারে এই ভয়ে সে রাত্রিশেষে আসিয়া কাজ করিয়া রাখিত; পরে বেলা হইলে চুক্তির কাজগুলি করিত। বেশী কাজ করিতে তাহাকে কখনও বলা হইত না। সে নিজ হইতে ঐ সব কাজ করিত। তা' ছাড়া বাসনপত্রগুলি সে এমন ভাবে মাজিত যে, সে গুলি ঝক্ ঝক্ করিত। একদিন হইল কি যে, সে বাসনগুলি মাজিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেগুলি খুব পরিষ্কার হয় নাই। আমার খেয়াল হইল আমি আবার ঐগুলি পরিষ্কার করি। আমি সেগুলি মাজিতে বসিয়া গেলাম। অন্যমনস্ক ভাবে মাজিতে মাজিতে সেগুলি খুব পরিষ্কার হইল। ইহা দেখিয়া সে ভাবিল যে, সে যে ভাবে বাসন পরিষ্কার করে তাহা বুঝি আমার মনঃপূত হয় না। তদবধি সে খুব পরিষ্কার করিয়া আমাদের বাসনপত্র মাজিত। তাহার পর হঠাৎ তাহার বিবাহ হইয়া গেল এবং ভগবানের এমন লীলা যে, সে বিদায় হইয়া যাওয়ার পর কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা ঢাকা চলিয়া আসিলাম। তাই দেখ,

ভগবানের নাম লইয়া থাকিলে তিনি এক ভাবে না এক ভাবে চালাইয়া নেন।"

আমি বলিলাম, "মা, তোমার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের সেরূপ নাও হইতে পারে।" মা বলিলেন, "ভগবানের নামে মাতিয়া থাকার অবস্থা আসিলে সংসারের কথা আর মনে থাকে না। তোমরা ত জান যে, চৈতন্য যখন সংসার ছাড়িয়া যা'ন তখন তাঁহার বুড়া মা ও স্ত্রী ছিল। চৈতন্য কি সে বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন? তুমি নাম করিয়া যাও, দেখিবে তোমার সমস্ত কাজ আপনা আপনি হইবে। ভগবানকে পরীক্ষা করিবার জন্য কিছু ফেলিয়া রাখিও না, তাহা হইলে কিন্তু কিছুই হইবে না। তাঁহাকে সব দিয়া দিও, তোমার ভার তিনি বহন করিবেন।"

মা'র সাধনসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি নাই। তবে তিনি নিজের সম্বন্ধে যে সামান্য কিছু বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহার সমস্ত অবস্থাই আপনা হইতে হইয়া গিয়াছে। যেন কোন অদৃশ্য মহাশক্তি তাঁহাকে আপন হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এক সময় মা মৌনী ছিলেন; কিন্তু তাহাও ইচ্ছাকৃত নহে। মা বলিতেন, "আমার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল, তাই কথা বলিতে পরিতাম না। কিন্তু যাহাকে যাহা ইঙ্গিত করিতাম সে তাহাই অনায়াসে বুঝিতে পারিত। এমন কি পরদিন যাহা করিতে হইবে তাহাও ইসারায় প্রকাশ করিতে পারিতাম।" যে নামকরা সম্বন্ধে মা এত জোর দেন তাহাও তাঁহার অনায়াসলব্ধ। মা বলিতেন, "নাম আমার আপনা হইতেই হইত;

উহা করিতে আমার চেষ্টা করিতে হইত না। ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদাই নাম চলিতে থাকিত। যদি কখনও কাহাকে কাজের কথা বলিতে হইত, কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাম আবার চলিতে থাকিত।" মা সম্পূর্ণরূপে নিজকে ভগবানের ইচ্ছাধীন করিয়া রাখিয়াছেন। কর্তৃত্ববোধ তাঁহার একেবারেই নাই। নিজকে তিনি ভগবানের হাতের যন্ত্র বলিয়া মনে করেন। তিনি মাঝে মাঝে বলেন, "ভগা এই দেহটা নিয়া কত খেলাই খেলিতেছে।" কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলেন, "উত্তর আমি দেই না, আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসে মাত্র; এ প্রশ্নও তোমার, উত্তরও তোমার।" মাকে একদিন বলিয়াছিলাম, "মা, শাস্ত্রে আছে যে, বাসনা হইতেই লোকের জন্ম হয়। তুমি প্রায়ই বল যে, ছোটবেলা হইতেই তোমার কোন কামনা-বাসনা নাই, তবে তুমি জন্মগ্রহণই বা কেন করিলে, আর এই মন্দির, আশ্রমই বা কেন স্থাপন করিলে?" মা হাসিয়া বলিলেন, "এত দিনে তুমি একটি প্রশ্নের মত প্রশ্ন করিয়াছ।" কিন্তু উহার উত্তর দিলেন না।

একদিন কথা প্রসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন, "তোমাদের যেরূপ দীক্ষা হয় আমার কিন্তু সেরূপ দীক্ষা হয় নাই, আমি একটু আভাস পাইয়াছিলাম মাত্র।" কিসের আভাস পাইয়াছিলেন এবং কি ভাবে পাইয়াছিলেন এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি নাই। এই গুহ্যাতিগুহ্য বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা দেবালয়ে অনধিকার প্রবেশের মত অশোভন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

সর্ব্বসাধারণকে মা যে উপদেশ দিতেন তাহার মূল কথা এই——"নাম করিয়া যাও দেখিবে সমস্ত জিনিষই আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে।

আমার ইহা হইয়াছে বলিয়াই আমি এত জোরের সহিত বলিতেছি। আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম সমস্তই নাম হইতে হয়। তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, তোমরা যখন কোন বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা কর তখন তোমাদের অজ্ঞাতসারে শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়? পরে হঠাৎ যখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কর তখন বুঝিতে পার যে, শ্বাস বন্ধ হইয়াছিল। চিন্তার সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের একটা সম্বন্ধ আছে। নাম করিতে করিতে এমন একটা অবস্থা আসে যখন প্রাণায়াম আপনা হইতেই হইতে থাকে। উহার জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না।”

কোন বিশেষ নামের উপর মা জোর দেন না। তিনি বলেন, “যাহার যে নাম ভাললাগে তাহা সর্ব্বদা জপ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।” এই “ভাললাগা” কথাটির মধ্যেও বোধ হয় মা’র একটু ইঙ্গিত আছে, যদিও কোন স্পষ্ট উক্তি নাই। অনেক সময় মা বলিতেন, “পূর্ব্বের সম্বন্ধ না থাকিলে একে অন্যের কাছে যায় না। যাহার সহিত যাহার যতটুকু সম্বন্ধ সে ততটুকু তাহার সঙ্গ করিতে খুঁজিয়া বেড়ায়। এই জন্য আশ্রমে কেহ আসিলে আমি তাহাকে বসিতে বা চলিয়া যাইতে বলি না, কারণ আমি জানি যে, পূর্ব্বজন্মে এই আশ্রমের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ ছিল তাহারাই কেবল এখানে আসিবে, এবং যাহাদের সম্বন্ধ যত বেশী গভীর সে তত বেশী এখানে যাতায়াত করিবে। কেহ হয়ত একবার আসিয়া আর আসিবে না, বা কিছুদিন আসা যাওয়া করিয়া চলিয়া যাইবে, আবার কেহ একবার

আসিলে আর চলিয়া যাইতে চাহিবে না। ইহাদের আসা যাওয়া পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ হইতে হয়। আমি বলিলেই যে ইহারা আসিবে, বা আমি বলিলেই যে চলিয়া যাইবে এমত নহে।" মা যে কথা আশ্রম-যাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় নামের বেলাও প্রযোজ্য। যে নাম লোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সাধন করিয়াছে সেই নামের প্রতি তাহাদের অনুরাগ থাকা সম্ভব। সেইজন্য বোধ হয় মা "ভাললাগার" উপরেই জোর দেন এবং কোন বিশেষ নামের উল্লেখ করেন না।

দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে মা স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলেন না। এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াও মা'র নিকট হইতে কোন সুস্পষ্ট জবাব পাই নাই। সর্ব্বদা নাম করাই মা'র প্রধান উপদেশ। তিনি বলেন, "কিছুই বৃথা যায় না, সমস্ত জিনিষেরই প্রয়োজন আছে। মনে কর তুমি রেলগাড়ীতে কোথায়ও যাইবে। গাড়ী ধরিবার জন্য তুমি গ্রাম হইতে নৌকাযোগে ঢাকা আসিলে, নৌকা হইতে নামিয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য একটি লাঠি ভর করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলে। যদিও রেলগাড়ীতে যাওয়াই তোমার উদ্দেশ্য তবু নৌকা, লাঠি, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতির কোনটাই যেমন তুমি বৃথা মনে করিতে পার না! সেইরূপ ভগবানকে লাভ করিতে তুমি যাহা কিছু করিতেছ, মনে রাখিও উহার প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। কিছুই বৃথা নয়। যে কোন নামে ভগবানকে ডাকিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। চাই কেবল সর্ব্বদা নাম করা।"

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, নাম করার সময় মন ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকে না। এইরূপ অস্থির মন লইয়া নাম করিলে

কি কোন ফল হয় ?" মা বলিলেন, "ফল নিশ্চয়ই হয়। নাম করিতে করিতে মন স্থির হইয়া যায়।"

ভক্তদের মধ্যে অনেকেই পুরুষকার, অভ্যাস ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কৃপার কথাই মাকে বিশেষ করিয়া বলিতেন। একদিন একজন ভক্ত মাকে বলিলেন, "মা, পুরুষকারের কি দরকার ? তুমি কৃপা করিলেই ত সব হইয়া যায়। দেখ না, জগাই মাধাইয়ের মত মহাপাপী মাতালও চৈতন্যদেবের কৃপায় উদ্ধার পাইয়া গেল।" মা উত্তর করিলেন, "নবদ্বীপে তখন জগাই মাধাইয়ের মত আরও অনেক মহাপাপী ছিল। কই, চৈতন্যদেব ত তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন না ? তিনি বাছিয়া বাছিয়া জগাই মাধাইকে কৃপা করিলেন কেন ? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছিল।" অনেক সময় মা হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "রসগোল্লার খোঁজ তোমাদিগকে বলিয়া দিলেও তোমরা চেষ্টা করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে চাও না। তোমরা চাও যে কেহ উহা আনিয়া একেবারে তোমাদের মুখের মধ্যে ফেলিয়া দেয়।"

আমি একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, যে গুরুদেব আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন তিনিই ত আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে উদ্ধার করা এখন তাঁহার দায়িত্ব। এ অবস্থায় আমার চেষ্টারই বা দরকার কি ?" মা বলিলেন, "ঠিক কথা, গুরুই ত সব করেন। তুমি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাক না, দেখিবে সবই হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি নির্ভর করিতে পারিতেছ কই ?"

ভগবানের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার কথাও মা নানা ভাবে বলিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "সাধুভাবে জীবন-যাপন করিলে যেরূপ মুক্তি পাওয়া যায়, চুরি বা ঐরূপ পাপ কর্ম্ম যাহারা করে তাহারাও মুক্তি পাইতে পারে। আসলে সৎ বা অসৎ বলিয়া কিছুই নাই। ডুবিয়া যাওয়াই হইতেছে আসল কথা।" মা'র কথা শুনিয়া আমার মনে হইল যে, আমাদের সমস্ত দুঃখের মূল হইল অহঙ্কার। এই আমিত্বজ্ঞান শেষ হইলে, নিজের কর্ত্তৃত্বজ্ঞানকে একেবারে লোপ করিয়া দিতে পারিলেই মুক্তি।

একবার আমার এক বন্ধুর ১০।১২ বৎসরের একটি মেয়ে পুকুরের জলে ডুবিয়া মারা যায়। যে দিন আমি এই মৃত্যুসংবাদ পাই, সে রাত্রিতে আর ঘুমাইতে পারি না। পরদিন প্রাতে আমি ঐ শোকাতুর বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া মা'র নিকট লইয়া যাই। তখন মা তাঁহার কুটীরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। মা'র নিকট যাইয়া আমার বন্ধুটির পরিচয় দিলাম, দুর্ঘটনাটির কথাও বলিলাম, এবং তাহাকে দুই একটি সান্ত্বনবাক্য বলিতেও মাকে অনুরোধ করিলাম। মা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ নিজকে কর্ত্তা মনে করিয়াই যত দুঃখ বরণ করিয়া নিয়াছ। যদি "আমার ছেলে" "আমার মেয়ে" এই ভাবটা না থাকিত, যদি স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদিকে ভগবানের ধন বলিয়া মনে করিতে পারিতে, তবে কষ্টের কোন কারণই থাকিত না। যার ধন তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিয়া আমরা কখনও দুঃখিত হই না, বরং দায় হইতে মুক্ত হইলাম মনে করিয়া শান্তিলাভ করি। যদি সত্যই তুমি তোমার মেয়েকে ভালবাস তবে তাহার জন্য কান্নাকাটি

করিও না, বরং যাহাতে তাহার সদ্‌গতি হয় সে জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিও। যখনই তুমি তোমার কন্যার জন্য কান্নাকাটি করিবে তখনই সে তোমার নিকট আসিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সে ত আর আসিতে পারিবে না, কারণ যে পর্দ্দা-দ্বারা সে তোমা হইতে এখন পৃথক্ হইয়া আছে তাহা ছিড়িবার সাধ্য তাহার নাই। সেরূপ চেষ্টা কেবল তাহাকে কষ্টই দিবে। তুমি মেয়ের জন্য কান্নাকাটি করিয়া কেবল তাহার বেশী কষ্টের কারণই হইবে। ইহাকে ত ভালবাসা বলে না। তাই তাহার কল্যাণের জন্য, শান্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর।” এইরূপ আরও অনেক কথা মা বলিলেন। আমি বলিলাম, “মা, মেয়েটি ত নিষ্পাপ, তবে তাহার এই অপমৃত্যু হইল কেন?” মা বলিলেন, “পিতা-মাতার পাপ হইতেও সন্তানের ভোগ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেকে আবার জন্মপূরণ করিতে আসে। ধর না উমার * কথা, সেও ফুলের মত নিষ্পাপ একটি ছোট মেয়ে ছিল, সে হঠাৎ মরিল কেন? ইহার উত্তর এই যে, তাহার ঐ কটা দিন ভোগ করিবার ছিল, তাই সে ভোগ করিয়া গেল।”

মা অনেক সময় সামান্য সামান্য বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ দেন। উপদেশগুলি গুরুত্বে ও মাধুর্য্যে বড়ই হৃদয়-গ্রাহী হয়। একদিন সকাল বেলা আশ্রমে বসিয়া আছি এমন সময়

---

* উমা শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সেন মহাশয়ের কন্যা। অতি অল্প বয়সেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহারই স্মৃতিরক্ষার্থে বিনয়বাবু আশ্রমে ‘নাম ঘর’ করিয়া দিয়াছেন।

মাঠে চড়িবার জন্য আশ্রমের গাভী দুইটির গলার দড়ি খুলিয়া দেওয়া হইল। এবং তাহারা আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে মাঠের দিকে রওনা হইল। গাভী দুইটির আনন্দাস্ফালন দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে জীবের এইরূপ আনন্দ হয়।"

আর একদিন আশ্রমে মা'র নিকট প্রমথবাবু, নগেনবাবু*, বাবা ভোলানাথ ও আমি বসিয়া আছি এমন সময় এক মুড়িওয়ালা আশ্রমে প্রবেশ করিল। মুড়ির বোঝা দেখিতে খুব বড় হইলেও ওজনে অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। সেইজন্য মুড়িওয়ালা বোঝাটি মাথায় করিয়াই প্রফুল্ল মনে এদিকে ওদিকে তাকাইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "ঐ মুড়িওয়ালা মুড়ির বোঝাটি যে ভাবে বহিতেছে, সংসারের বোঝাও সেই ভাবে তোমাদের বহন করা উচিত। দেখ, উহার মাথায় এত বড় বোঝা, কিন্তু ও কেমন হাসি মুখে সব দেখিয়া লইতেছে! তোমাদেরও ঐরূপ আনন্দ করিতে করিতে সংসারের বোঝা বহিয়া চলা উচিত।

এই মুড়িওয়ালাকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি ঘটনা হয় তাহাও এখানে উল্লেখ করিতেছি। মুড়িওয়ালাকে দেখিয়া মা প্রমথবাবুকে বলিলেন, "বাবা, আমাকে মুড়ি খাওয়াও না।" প্রমথবাবু বলিলেন, "বেশত, এর আর ভাবনা কি? তুমি যত মুড়ি খাইতে চাও তাহা খাও।" মা বলিলেন, "উহার সমস্ত মুড়ি কিনিয়া রাখ।" লোকটি ২৲ কি ২॥৹ টাকায় সমস্ত মুড়ি বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল। প্রমথবাবু রুমাল হইতে টাকা বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন, তখন মা বলিলেন, "তুমি সমস্ত টাকা

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র রায়। ইনি একজন কণ্ট্রাক্টার।

দিও না, অর্দ্ধেক তুমি দাও আর বাকী অর্দ্ধেক নগেনবাবু দিক্।" প্রমথ ও নগেনবাবু ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম আমি। মা আমাকে বাদ দিলেন দেখিয়া আমি মনে মনে স্বস্তি বোধ করিয়াছিলাম, কেন না আমার সঙ্গে একটি পয়সাও ছিল না। আমাকে মুড়ির দামের কোন অংশ দিতে বলিলে আমি লজ্জা পাইতাম। কিন্তু লোকে বলে, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়।" নগেনবাবু মাকে বলিলেন, "মা, তুমি আমাদের দুইজনকে দাম দিতে বলিলে, অমূল্যবাবুকে ত কিছু বলিলে না ? মা বলিলেন, "বেশ ত, তোমরা তিন জনেই দাম দাও। আমার আপত্তি কি ?" পরে আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া নগেনবাবুকে বলিলেন, "তুমি অমূল্য বাবুকে দাম দিতে বলিলে, জিজ্ঞাসা করত অমূল্য বাবুর নিকট পয়সা আছে কি না।" বাবা ভোলানাথ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। তাঁহার বোধ করি বিশ্বাস ছিল যে, আমি একেবারে রিক্ত হস্তে আসি নাই। তিনি ভাবিলেন মা'র অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করিয়া খুব একটা কৌতুক করিবেন। সেই জন্য তিনি খুব আত্মপ্রত্যয় সহকারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, আপনার নিকট পয়সা নাই ?" আমি বলিলাম, "না।" ভোলানাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা আছে বুঝি ?" আমি বলিলাম, "না, কিছুই নাই।" এদিকে মা হাসিতে হাসিতে লুটাপুটি খাইতেছিলেন, এবং আমি যখন বলিলাম যে, আমার নিকট কিছুই নাই তখন সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। বাবা ভোলানাথ কিছু অপ্রতিভ হইয়া নীরব রহিলেন।

অন্য একদিন সকাল বেলা আশ্রমে যাইয়া দেখি এক ভদ্রলোক স্ত্রী ও একটি বিধবা কন্যা সঙ্গে করিয়া মা'র নিকট বসিয়া আছেন।

মা মেয়েটির দিকে তাকাইয়া আছেন। মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইবে। এই বালবিধবাকে দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। মেয়েটির চোখে এমন একটা সকরুণ দৃষ্টি ছিল যাহা দেখিলে প্রাণ আপনা হইতেই কান্দিয়া উঠে। মা যেন তাহাকে কি বলিতেছিলেন এবং সে ঈষৎ হাসিতেছিল। কিন্তু সে হাসি এত ম্লান যে, তাহা মুখে যেন ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। আমি যাইয়া মাকে প্রণাম করিতেই মা আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এই মেয়েটির বেশ দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হইতেছে।" এ কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কারণ মেয়েটি নিরাভরণা, পরিধানে একখানি সরুপেড়ে ধুতি, মুখেচোখে উদাসপূর্ণ সকরুণ ভাব। ইহা দেখিয়া আনন্দের পরিবর্ত্তে তাহার বিপরীত ভাবই মনে জাগিয়া উঠে। মা'র কথা না বুঝিয়া আমি বলিলাম, "তোমার কথার অর্থ বুঝিলাম না।" মা বলিলেন, "কেন, দেখিতেছ না ওর বিধবার বেশ। ভগবান্ উহাকে সংসারের মায়া-মমতা, জ্বালা-যন্ত্রণা ইত্যাদি হইতে মুক্ত করিয়া কি সুন্দর যোগিনীর সাজে সাজাইয়াছেন। স্বামী, পুত্র, সংসার ইত্যাদি কিছুর চিন্তাই ইহাকে আর করিতে হইবে না। সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ভগবান্ ইহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের করিয়া নিয়াছেন। এই যোগিনীবেশ দেখিলে কি আনন্দ হয় না?" এতক্ষণে মার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আমি নীরব রহিলাম।

মা অনেক সময় অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়া আধ্যাত্মিক জগতের গভীরতম রহস্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। একদিন আমি মাকে জিজ্ঞাসা

করিলাম, "মা, ব্রাহ্মীস্থিতি কাহাকে বলে?" মা হাসিঠাট্টার ভাবে বলিলেন, "উহা দিয়া আমাদের কি দরকার?" মা এমনি ভাবে কথাটি বলিলেন যে, না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিতও হইলাম। সাধনরাজ্যে আমার হাতেখড়িও হয় নাই, অথচ প্রশ্ন করিবার সময় মস্ত একটা কথার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি যে লজ্জা পাইলাম মা তাহা বুঝিলেন। তাই আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা, বাবা, কেহ যদি এম এ পাশ করিয়া ছোট ছোট ছেলেদিগকে পড়াইতে আসে তবে তাহার কি বিদ্যাহ্রাস হয়, না আর কিছু হয়?" বুঝিলাম মা ব্রাহ্মীস্থিতি ব্যাখ্যা করিতেছেন। এম এ পাশ করিয়া ছোট ছেলেদের অধ্যাপনা করিলে যেমন সেই ব্যক্তির অর্জ্জিত জ্ঞানের হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি হয় না; তাহার জ্ঞান তাহার বাক্যে ও চিন্তায় অটুট ভাবেই থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মে যাহার একবার স্থিতি হইয়াছে, তিনি সংসারের যে কাজই করুন না কেন ব্রহ্মজ্ঞান হইতে তাঁহার ক্ষণমাত্রও বিচ্যুতি নাই। মা'র প্রশ্ন শুনিয়া আমি বলিলাম, "মা, এই ত ব্রাহ্মীস্থিতি বুঝিলাম।" মা সংক্ষেপে বলিলেন, "ভাষাদ্বারা যতদূর বুঝা সম্ভব তাহা বুঝিলে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মীস্থিতি অনুভূতির জিনিষ ভাষায় উহা ব্যক্ত করা যায় না; কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া চলে মাত্র।

ভাষার সাহায্যে যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ব্যক্ত করা যায় না তাহা মা অনেক সময় অনেক ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাকে আমরা ব্রহ্মানন্দ বলিয়া বর্ণনা করি তাহাও নাকি বস্তুতঃ আনন্দ নয়। মা বলিতেন, "আনন্দ থাকিলেই উহার পশ্চাতে নিরানন্দ থাকিবে। ব্রহ্মানুভূতি আনন্দ ও নিরানন্দের বাহিরের এক অবস্থা। যেমন ভিজা কলসী

দূর হইতে দেখিলেই তোমরা উহা জলে ভরা মনে কর, কারণ সাধারণতঃ জলভরা কলসীই ভিজা দেখায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ লোকের হাবভাবে আনন্দের মত একটা ভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু উহা আনন্দ নহে। সে ভাবটা যে কি তাহা ভাষার অতীত।”

আর একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, জাতিস্মর হইতে ভিন্ন সাধন করিতে হয়, না ব্রহ্মপ্রাপ্তির মার্গেই লোকে জাতিস্মর হয়?” মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “জাতিস্মর কাহাকে বলে?” আমি বলিলাম, “যাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই জাতিস্মর বলে।” মা বলিলেন, “দেখ, সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যই নিজকে জানা। নিজকে বিশেষ ভাবে জানিতে হইলেই আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি এবং পরে কি হইব ইহা সমস্তই জানিতে হয়। সাধন-ভজন করিয়া লোকে এই আত্মজ্ঞানই লাভ করে। কাজেই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিই বল, আর জাতিস্মর হওয়াই বল, সমস্তই নাম করিতে করিতে হইয়া যায়। এর জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না।” মা আরও বলিলেন, “নাম করিতে করিতে আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ ও শক্তির সহিত পরিচয় হয় ও লাভ করা যায়। এ সমস্ত সাধনের পথেই পড়ে। যখন ঐ সব শক্তি উপস্থিত হয়, তখন উহা কেবল দেখিয়াই যাইতে হয়। উহা লইয়া খেলা করিতে গেলেই সাধক আর গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে না পথেই সে আবদ্ধ হইয়া যায়। মনে কর তুমি এই আশ্রম হইতে রেলষ্টেশনে যাইবে; রাস্তায় যাইতে

যাইতে ঘর, বাড়ী, কলেজ ইত্যাদি কত কি দেখিবে। তুমি যদি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইতে থাক তবেই ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারিবে। আর যদি পথে চলিতে চলিতে তোমার ইচ্ছা হয় যে, কলেজের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখা যাক্ না কলেজটি কেমন, তবেই কলেজে তুমি আবদ্ধ হইয়া পড়িলে, কবে এবং কখন যে ষ্টেশনে পৌঁছিবে তাহার নিশ্চয়তা থাকিবে না।"

উপদেশ প্রদান করিতে কিংবা কোন গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যদিও মা আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপার হইতেই উদাহরণ গ্রহণ করিয়া বিষয়টি প্রাঞ্জল করিতে চেষ্টা করিতেন, তবুও অনেক সময় এরূপ হইয়াছে যে, মা'র কথা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। একদিন মা বলিলেন, "সেই দেখাই ত দেখা যাহা দেখিলে, দেখিবার সাধ চিরদিনের মত চলিয়া যায়; সেই শুনাই শুনা যাহা শুনিলে, শুনিবার সাধ একেবারে চলিয়া যায়। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "মা, তাহা হইবে কেন? আমরা ত এমন শুনিয়াছি যে, সাধককে উৎসাহ দিবার জন্য এবং তাঁহার আগ্রহবৃদ্ধির জন্য ভগবান্ মাঝে মাঝে ক্ষণিক দেখা দিয়া যান। এই যে দর্শন ইহাকে কি প্রকৃত দর্শন বলিব না?" মা উত্তর করিলেন, "এই মাত্র বলিলাম যে, যাহা দর্শন করিলে আর দর্শন করিবার কিছুই থাকে না, এমন কি দর্শন করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় তাহাই যথার্থ দর্শন।" মা'র এই উক্তি পূর্ব্বোক্তির পুনরাবৃত্তি মাত্র। তিনি আর ইহাকে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন না।

আমি অনেক সময় আমার গুরুদেবের কথা মাকে বলিতাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে মা আমাকে বলিলেন, "তুমি শিষ্য নও, শিষ্য হইতে চেষ্টা

করিতেছ মাত্র।" আমি বলিলাম, "কেন, মা, যথারীতি গুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলাম, তবে শিষ্য হইতে বাকি রহিল কি?" মা শিষ্য শব্দটির এমন এক বিশেষ অর্থ করিলেন যাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। একদিন সুপ্রসিদ্ধ রামঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মা'র কথার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। আমি রাম ঠাকুর মহাশয়কে গুরুশিষ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি প্রথমে যে উত্তর দিলেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। তৎপর আমি আমার কথাটি ভালরূপে বুঝিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, "বাবা, আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমার বোধগম্য হইল না। আমি জানিতে চাই যে, যদি একটি লোক আপনার কাছে নামপ্রার্থী হইয়া আসে এবং আপনি যদি কৃপা করিয়া তাহাকে নাম দেন, তাহা হইলে ঐ লোকটির সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ হইল? ঐ লোকটি কি আপনার শিষ্য হইল না?" তিনি উত্তর করিলেন, "শিষ্য হইল কোথায়? গুরুবাক্য যে সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করে, সেই শিষ্য। তোমরা কি আরুণির গল্প জান না? গুরু তাহাকে ক্ষেত্রের জল বন্ধ করিতে বলিলেন। আরুণি সমস্ত দিন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও জল বন্ধ করিতে না পারিয়া জলনিঃসরণের পথে শুইয়া পড়িল। তখনই গুরু আসিয়া তাহাকে ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। আরুণির মত নিজকে শোয়াইয়া দিতে না পারিলে শিষ্য হওয়া যায় না।" এতদিনে বুঝিলাম মা কি অর্থে আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি শিষ্য নও, শিষ্য হইতে চেষ্টা করিতেছ মাত্র।" সর্ব্বতোভাবে গুরুতে আত্মসমর্পণ করাই শিষ্যত্বের লক্ষণ। যে পর্য্যন্ত সেরূপ আত্মনিবেদন না হয়, শরণাপত্তির ভাব জাগিয়া না উঠে, যে পর্য্যন্ত পুরুষকারের লেশ মাত্র থাকে, সে পর্য্যন্ত শিষ্যের যথার্থ শিষ্যত্ব হয় না।

অনেক সময় মা বলেন, "তোমরা যে প্রশ্ন কর উহার উত্তর আমি দেই না। প্রশ্নও তোমাদের, উত্তরও তোমাদের কেবল আমার মুখ হইতে বাহির হয় মাত্র।" এগুলি আপাততঃ হেয়ালী বলিয়া মনে হয়। অথচ মাকে অবিশ্বাস করিবার সাধ্য নাই। তিনি প্রায়ই বলেন, "আমি যাহা বলি তাহা মিথ্যা নয়, কারণ আমি ত কিছু বলি না। তিনি যে সব বলান।" মা যে ভাবে এই সব কথা বলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে না। যিনি নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের খণ্ডচৈতন্য ধুইয়া মুছিয়া অদ্বৈত বিরাট চৈতন্যের সহিত ওতপ্রোত ভাবে যুক্তাবস্থায় বিরাজ করিতেছেন, তাহার প্রেরণার মূল অনুধাবন করা বা তাহার বাক্যাবলী সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা আমাদের সাধ্যাতীত।

অনেক সময় আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, মা বোধ করি ভক্তদের সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ভক্তের জন্য বিভিন্ন ভাবে দিয়া থাকেন। একদিন আমি ও গণেশবাবু আশ্রমে মা'র নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় গণেশবাবু মাকে প্রশ্ন করিলেন, "মা, শিষ্য আর ভক্ত কি এক নয়?" মা বলিলেন, "হাঁ, এক।" আমি বলিলাম, "মা, ভক্ত ও শিষ্যের মধ্যে বোধ করি একটু পার্থক্য আছে। ভক্ত চায় গুরুর হাত ধরিতে, আর গুরু শিষ্যের হাত ধরিয়াই আছেন।" মা বলিলেন, "হাঁ, তা'ই।" মা আমাদের দুইজনকেই তুষ্ট করিলেন।

মা'র উপদেশের অতি সামান্যাংশই এখানে বিবৃত করা হইল এবং যে ভাবে করা হইল তাহাতে তাহা কতকটা রক্তমাংসশূন্য কঙ্কালের মত হইল। যিনি মা'র মুখে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, কেবল তিনিই তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। মা'র কথা বলিবার অনুপম

ভঙ্গি ভাষায় ফুটাইয়া উঠান অসম্ভব। তাহা ব্যতীত মা'র মুখমণ্ডলে ও দৃষ্টিতে এমন সব ভাবের সমাবেশ দেখা যায় যে, তাহা বিশ্লেষণ করিবার সমস্ত প্রয়াসকে উপহাস করিয়া থাকে। এক সময় মাকে দেখিয়া মনে হয়, মা যেন অনাশক্তা নির্লিপ্তা, সুখদুঃখাতীতা মর্ম্মরমূর্ত্তি বিশেষ ; আবার অন্য সময় তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, মা যেন আমার দুঃখহারিণী, বিশ্বপাবনী, করুণারূপিনী জগজ্জননী।

১৩৩৮ সনের শিবচতুর্দ্দশীর পরদিন মা সকাল বেলা আশ্রমের বাহিরে বসিয়াছিলেন। সেই সময় যাইয়া আমি তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরে খুকুনী দিদি, বেবী দিদি ও আর একটি স্ত্রীলোক মা'র নিকট আসিলেন। শুনিলাম তাঁহারা গত রাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরী-আশ্রমে সমস্ত রাত্রি নাম করিয়া সকাল বেলা মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। ইঁহারা আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। বেবী দিদি আবদার করিয়া হাস্য মুখে মাকে বলিলেন, "মা, আমরা সারারাত জাগিয়া নাম করিলাম, এখন হইতে তুমি আমাদিগকে বেশী ভালবাসিবে না ?" মা কোন উত্তর না দিয়া স্মিতাননে মাঠের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ইঁহারা চলিয়া গেলে আমি মাকে বলিলাম, "মা, বেবী দিদি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি তাঁহাকে বেশী ভালবাসিবে কি না তখন আমার এই কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল যে, মা কাহাকেও ভাল বা মন্দ বাসিতে পারেন না। মা'র কাছে কোন কথা বলাও যা' আর মন্দিরের পাষাণমূর্ত্তির কাছে বলাও তা'।" আমার কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, এ কথা সত্য যে, আমি ভাল বা মন্দ বাসিতে পারি না। তবে ইহাও সত্য যে, আমি যেরূপ ভালবাসিতে পারি, জগতে এমন আর কেহ পারে না।" ইহা একটা আশার কথা বটে।

১৩৩৯ সনে মা'র জন্মোৎসবের পূর্ব্বে আশ্রমে একটি নলকূপ (tube well) করিবার কথা হইয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে একদিন দুপুর বেলা তারকবাবু * এবং প্রফুল্লবাবু † আশ্রমে আসিয়াছিলেন। নল কোথায় বসান হইবে তাহা প্রফুল্লবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা উত্তর করিলেন, "আমি কি জানি ? আমি তোমাদের মেয়ে। তোমরা আমাকে জল দিবে আমি খাইব। তোমরা আমাকে যাহা দিবে আমি তাহাই নিব। তোমরা ঘোলা জল দিলেও ত আমাকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।"

পঙ্কিল বিষয়াবর্ত্তে নিমজ্জমান জীবের পক্ষে মা'র এই কথাগুলি বড়ই আশার বাণী। আমরাও বলি "তাই যেন হয়, মা, আমাদের কামনা-কলুষিত হৃদয়গুলি তোমার পাবনস্পর্শে যেন দেবসেবার যোগ্য হইয়া উঠে!"

LIBRARY
No............
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS.

* শ্রীযুক্ত ডাক্তার তারকচন্দ্র দত্ত। ইনি ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের Asst. Superintendent ছিলেন।

† শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ইনি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র। ইঁহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাতৃদর্শনে দেরাছুন।

১৩৩৯ সনে জন্মোৎসবের পর ৺জ্যোতিষবাবু এবং বাবা ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া শ্রীশ্রীমা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হঠাৎ ঢাকা-নগরী ত্যাগ করেন। লৌকিক ভাবে পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া কোন কাজ করা মায়ের স্বভাব নহে। সঙ্কল্পবিকল্পের দ্বন্দ্ব তাঁহার মধ্যে নাই। বারিধির বীচিবিক্ষেপের মত মা'র চিদাকাশে কখনও কখনও সঙ্কল্প আপনি জাগিয়া উঠে এবং উঠামাত্র কার্য্যে পরিণত হইয়া যায়। এইজন্য শ্রীশ্রীমা'র কার্য্য-কলাপ একদিকে যেমন দুর্ব্বোধ, অন্যদিকে আবার তেমনি দুর্নিবার। উৎসবের শেষদিন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সকলে আশ্রমে বিশ্রাম করিতেছেন। তখন রাত্রি ১০টা হইবে। এমন সময় মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন যে, তিনি ঐ রাত্রেই ঢাকা ত্যাগ করিবেন। তখনই ৺জ্যোতিষবাবুকে তাঁহার বাড়ী হইতে আশ্রমে ডাকিয়া আনা হইল এবং রাত্রি ১২টার গাড়ীতে মা রওনা হইলেন। ৺ জ্যোতিষবাবু দ্বিতীয় একখানি বস্ত্র বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিবার, বা স্ত্রীপুত্রের নিকট বিদায় লইবারও অবকাশ পাইলেন না। ইঁহারা গোরক্ষপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া দেরাছুনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পরে দেরাছুন হইতে ৪।৫ মাইল দূরে রায়পুর নামক এক গ্রামের নির্জ্জন শিবমন্দিরে সকলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে বাবা ভোলানাথের কঠোর তপস্যা আরম্ভ হইল। তিনি মৌনী হইলেন এবং দিবারাত্র শিবমন্দিরের মধ্যে সাধনভজনে কাটাইতে লাগিলেন। ৺জোতিষবাবু কিছুদিন তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিয়া পুনরায়

তাঁহার কর্ম্মস্থল ঢাকা-নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনিও বেশী দিন চাকুরী করিতে পারিলেন না। তাঁহার চাকুরী শেষ হইবার নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আবার শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে মিলিত হইলেন। বাবা ভোলানাথ কিছুদিন রায়পুরে বাস করিয়া উত্তর কাশীতে গমন করিলেন এবং তথায় নিজকে উগ্র তপস্যায় নিয়োজিত করিলেন। এদিকে মা ৺জ্যোতিষবাবুকে সঙ্গে করিয়া মুশৌরী, দেরাদুন, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রায় দুই বৎসর কাল উত্তর কাশীতে সাধন-ভজন করিয়া বাবা ভোলানাথ তথায় এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিগ্রহাদি স্থাপিত করেন। ঐ মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তথায় ঢাকা ও কলিকাতা হইতে বহু ভক্তের সমাগম হয় এবং শ্রীশ্রীমা এই ভক্তবৃন্দ সহ উত্তর কাশীতে গমন করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর বাবা ভোলানাথ উত্তর কাশী ত্যাগ করিয়া কিছুদিন এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া জ্বালামুখীতে যাইয়া পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করেন। এই সময় মা ৺জ্যোতিষবাবুকে সঙ্গে করিয়া বৈজনাথ প্রভৃতি স্থান ভ্রমন করিয়া শেষে দেরাদুন আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকা ত্যাগের পর প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মাকে একবারও না দেখিয়া কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। ১৩৪২ সনের পূজাবকাশে মাকে দর্শন করিতে দেরাদুন রওনা হইলাম।

২৫শে আশ্বিন দেরাদুন এক্সপ্রেসে স্ত্রী ও কনিষ্ঠা কন্যা সতীকে সঙ্গে করিয়া হরিদ্বার রওনা হইলাম। ৺জ্যোতিষবাবু এক চিঠিতে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, আমরা যদি হরিদ্বার হইয়া দেরাদুন গমন করি তবে যেন নান্‌কী বাইয়ের ধর্ম্মশালায় শ্রীশ্রীমায়ের খবর লই।

শ্রীশ্রীমা হরিদ্বার থাকিতে পারেন মনে করিয়া টিকিট দেরাদুন পর্যান্ত না করিয়া হরিদ্বার পর্য্যন্ত করিলাম। ২৭শে আশ্বিন হরিদ্বারে পৌঁছিলাম, কিন্তু মাকে তথায় না পাইয়া সেই দিনই বেলা ৯টার গাড়ীতে দেরাদুন রওনা হইলাম। বেলা প্রায় ১২টার সময় দেরাদুনে পৌঁছিয়া এক নূতন সঙ্কটে পড়িলাম। ৺জ্যোতিষবাবু হরিদ্বারের ঠিকানা দিয়াছিলেন, কিন্তু দেরাদুনে মা কোথায় আছেন সে ঠিকানা দেন নাই। কাজেই একখানা টাঙ্গা লইয়া মাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। অনেক খুঁজিয়া অবশেষে রাজপুর রোডে ৫৯ নং বাড়ীতে মাকে পাইলাম। বাড়ীটি বেশ বড়। ইহার একাংশে গৃহীরা বসবাস করেন এবং দূরে অন্য এক অংশ সন্ন্যাসীদের আশ্রমরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার নাম কৃষ্ণাশ্রম। মা তখন ঐ কৃষ্ণাশ্রমে ছিলেন।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, পশ্চিমদিকের বারান্দায় মা আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শুইয়া আছেন। মাকে ঐ অবস্থায়ই মনে মনে প্রণতি নিবেদন করিয়া আমাদিগকে বাসস্থানের খোঁজে বাহির হইতে হইল। ৺জ্যোতিষবাবু আমাদের জন্য যে বাসার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে নানা প্রকার অসুবিধা দেখিলাম। জ্যোতিবাবু* আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত তাজমহল হোটেলে যাইয়া একটি কোঠা ভাড়া করিলাম। ভাড়া দৈনিক ১৷৷০। তথায় স্নানাহার সমাপন করিয়া পুনরায় মা'র নিকট রওনা হইলাম।

তখন বেলা প্রায় ৩৷৷০ কি ৪টা হইবে। এবার যাইয়া দেখি মা বাড়ীর পূর্ব্বদিকের বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। প্রণাম

---

* শ্রীযুক্ত নরসিংহ চট্টোপাধ্যায় এম এ। ইনি সম্প্রতি মথুরা কলেজে অধ্যাপনা করেন। মা ইহার নাম রাখিয়াছেন 'জ্যোতিঃ।'

করিতেই মা হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "আমি উঠিয়া বলিতেছিলাম বাবাজী (অর্থাৎ আমি) আমাকে ফেলিয়াই চলিয়া গেল।"

আমি। মা, বাসা ত ঠিক ছিল না। একটি থাকিবার স্থান ঠিক করিতে গিয়াছিলাম, তাই অপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

মা। তাহা আমি শুনিয়াছি।

সতী প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, "আমার চুলগুলি আসিয়াছে। দুইদিন পূর্ব্বেও মনে করিতেছিলাম যে, আমি এখানে আছি আর আমার চুলগুলি অন্য জায়গায় পড়িয়া আছে।"

আমি। মা, এসব কথার অর্থ কি ?

মা। ইহার (অর্থাৎ সতীর) চুল যে, আমার চুল তাহা তুমি আজ প্রথম শুনিলে ?

আমি। না, ইহা পূর্ব্বেও শুনিয়াছি ; কিন্তু এসব কথার অর্থ কি ?

মা কোন উত্তর দিলেন না কেবল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজীর খট্‌কা লাগিয়াছে।" পরে ঢাকায় কে কেমন আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি। তুমি কি এসব জান না যে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে ?

মা আবার তাঁহার ভুবনভুলান হাসি হাসিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, "কথা বলা ত চাই।"

আমি। তবে বুঝি সুধু কথা বলিতেই তুমি এসব প্রশ্ন কর ?

মা আবার হাসিয়া উঠিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দ বলিলেন, "সুধু কথা বলিতে কেন ? আপনি ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলে কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, মা কা'র কা'র কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ?

তাঁহারা যদি জানিতে পারেন যে, মা তাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তবে মনে মনে তাঁহারা কত সুখী হইবেন।"

মা। কেমন, বাবাজী, এখন জব্দ হইয়াছে ত ?

আমি। হাঁ, তবে তুমিও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছ যে, আমাদের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই তুমি সব জানিতে পার।

নাম করা এবং নাম হওয়া

ইহার পর আমার এক গুরুভ্রাতার কথা উঠিল। আমি বলিলাম, "মা, তুমি বল যে, নাম করিতে করিতে সবই লাভ হয়, শান্তি, মুক্তি সবই নাম হইতে হয়। কিন্তু আমার একজন গুরুভাই আছেন; তিনি দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ ঘণ্টা নাম করিয়াছেন। তিনি আমাকে এক সময় বলিয়াছিলেন, "দেখ্, আমি পুস্তক পাঠ করি, কি তো'দের সঙ্গে কথা বলি, ভিতরে ভিতরে, কিন্তু আমার নাম চলিতেছে। উহা এক সময়ের জন্যও বন্ধ হয় না।" এখন তিনি নাস্তিক।"

মা। নাস্তিক নাকি ?

আমি। নাস্তিক ঠিক নয়, তবে তিনি বলেন যে, ভগবান্ বলিয়া কেহ থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। ইহা ঠিক্ নাস্তিকতা না হইলেও নাস্তিকতার রূপান্তর মাত্র। তাহা ছাড়া এখন তিনি গুরুতেও খুব ভক্তিমান্ নহেন, দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, বলেন, "শাস্ত্র সব মিথ্যা।" তিনি এখন নিজেই পুস্তক লিখিতেছেন তাহাতে তিনি দেখাইবেন যে, এ যাবৎ ভগবান্ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহা সবই মিথ্যা এবং

তিনি প্রমাণ করিয়া দিবেন যে, ভগবানকে জানিবার কোন উপায় নাই। নাম করিয়া যদি এই অবস্থা হয় তবে নামের উপর লোকের ভক্তি বা বিশ্বাস থাকিবে কেন?

মা। তুমি বাবাজীর সম্বন্ধে যাহা বলিলে তাহাতে মনে হয় যে, বাবাজীর খুব উচু অবস্থা। ইহাও একটি সাধনের অবস্থা যখন সমস্ত জিনিষের উপর অবিশ্বাস আসে। তাহা ছাড়া, বাবাজী ত কিছু অন্যায় বলে না। বাবাজী যদি আমাকে এ সব কথা বলিত তবে আমি বলিতাম, "বাবাজী, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা খুবই সত্য"। (নিজকে দেখাইয়া) এ দেহের উপর ত কত অবস্থাই চলিয়া গিয়াছে, কাজেই আমি বুঝিতে পারি যে, বাবাজী কোন্ অবস্থার কথা বলিতেছে। এক অর্থে ত দেব, দেবী, শাস্ত্র, সমস্তই মিথ্যা। যাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না তাঁহাকে ভাষার মধ্যে বদ্ধ করিতে গেলেই মিথ্যা হইয়া যাইবে। এই অর্থে শাস্ত্রও মিথ্যা এবং দেবতাও মিথ্যা। বাবাজী যে পুস্তক লিখিতেছে তাহা যাহারা বাবাজীর অবস্থা লাভ করিবে তাহাদের খুব উপকারে আসিবে। তবে তুমি বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, বাবাজী শাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া আবার সেই মিথ্যাই সৃষ্টি করিতেছে কেন? কারণ বাবাজী যাহা লিখিতেছে উহা শাস্ত্র বই আর কি? আর তুমি যে নাম করার কথা বলিলে, মনে রাখিও, নাম করা একেবারে বৃথা নয়। বাবাজী ঐরূপ নাম করিয়াছিল বলিয়াই এই অবস্থা লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, নাম করা

এক কথা, নাম হওয়া আর এক কথা। বাবাজী স্থধু নামই করিয়াছে, তাহার কিন্তু আপনা হইতে নাম হয় নাই।

আমি। নাম করা ত বুঝি। নাম হয় কিরূপে? কি হইলে বুঝিব যে, নাম হইতেছে?

মা। যখন দেখিবে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাম আপনা আপনি চলিতেছে, যখন দেখিবে কর্ম্মান্তরে তোমার অন্যত্র যাওয়া দরকার, কিন্তু নাম তোমাকে যাইতে দিতেছে না, যখন দেখিবে নাম তোমার ইচ্ছা ও কর্ম্মের শক্তি দখল করিয়া বসিয়াছে, তখনই বুঝিবে নাম হইতেছে। সেইরূপ ধ্যান করা এক কথা এবং ধ্যান হওয়া আর এক কথা। লোকে ধ্যান করিতে চেষ্টা করে মাত্র; কিন্তু যখন সত্যসত্যই ধ্যান হয় তখন বুঝিতে পারে যে, এই দুইটির মধ্যে কত প্রভেদ।

আমি। আমার গুরুভাইটি যখন ধ্যান করিতেন তখন মধুর ঘণ্টাধ্বনি ও বংশিধ্বনি শুনিতে পাইতেন। জ্যোতিঃও নাকি দেখিতেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, এ সব ধ্বনি কোথা হইতে আসে তাহা তিনি জানেন কি না। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মাত্র ধ্বনি শুনিয়াছি, উহা কোথা হইতে আসে তাহা জানি না।" এ ধ্বনিগুলি কি, মা?

মা। আমি তোমাকে বলিতেছি, যখন কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত হয় তখন নাভিমূলে যে সব গ্রন্থি আছে তাহা খুলিতে আরম্ভ করে। এই সব গ্রন্থিভেদ হইলেই নানারূপ শব্দ শুনা যায় ও জ্যোতিঃ দেখা যায়। কোন গ্রন্থি ভেদ হইলে শব্দ শুনা যায়।

ইহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। ইহা সর্ব্বদাই হইতেছে, কিন্তু চিত্ত স্থির না হইলে উহা শুনা যায় না। ইহা জগতের যাবতীয় ধ্বনির সমষ্টি। যেমন শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসি ইত্যাদির শব্দ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এগুলি একত্র বাজাইলে সব শব্দ একত্র মিলিয়া ভিন্ন এক রকম শব্দ হয়, অনাহত ধ্বনিও ঐরূপ। জগতের এমন কোন ধ্বনি নাই যাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে; অথচ জগতের সমস্ত ধ্বনিই ইহা হইতে উৎপন্ন। সেইরূপ আবার অন্য এক গ্রন্থি ভেদ হইলে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। এ জ্যোতিঃও অপার্থিব। জগতের কোন আলোর সঙ্গেই ইহার তুলনা হয় না। রূপ সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। গ্রন্থিভেদের সঙ্গে সঙ্গেই লোকের সংস্কার অনুসারে নানারূপ দর্শন হয়। আবার সমস্ত রূপ এক রূপে লয় হইয়া যায়। জগতের সমস্ত জিনিষই এক মূল হইতে উৎপন্ন। গ্রন্থিভেদ হইলেই এসব বুঝিতে পারা যায়। যাহার সমস্ত গ্রন্থি ভেদ হইয়াছে কেবল সে-ই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ বুঝিতে পারে। যাহার মাত্র আংশিক ভেদ হইয়াছে সে সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে পারে না। সেইজন্য বাবাজী বলিয়াছে যে, কোথা হইতে শব্দ আসে তাহা সে জানে না। কেবল শব্দগুলি শুনিতে পায় মাত্র।

আমি। মা, সাধনে এতদূর অগ্রসর হইয়াও তিনি গুরুকে বলেন মূর্খ। আমরা জানি যে, গুরুতে একনিষ্ঠ ভক্তি না থাকিলে সাধনে সিদ্ধিলাভ করা সুদূরপরাহত।

মা। বাবাজীর এখন খণ্ডনের অবস্থা। যাহা কিছু তাহার সম্মুখে পড়িতেছে, বাবাজী তাহাই কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেছে। তোমরা কি দেখ না যে, অনেকে বাগান পরিষ্কার করিতে যাইয়া আগাছার সঙ্গে লাউ, কুমড়া ও মূল্যবান ফলের গাছও নিঃশেষ করিয়া ফেলে? বাবাজীরও সেই অবস্থা হইয়াছে। বাবাজী বিচারদ্বারা সংস্কার মুক্ত হইতেছে। এ অবস্থায় দেবতা, গুরু কিছুই থাকিবে না, কারণ দেবতার মত গুরুও একটি সংস্কার ভিন্ন আর কি? বাবাজীর অবস্থায় যে আসিয়াছে তাহারই কেবল ঐ ভাবে গুরুকে আক্রমণ করা সাজে। তোমাদের পক্ষে ওরূপ করা অন্যায় হইবে।

এসব কথার পর অন্য কথা আরম্ভ হইল আমি বলিলাম, "মা, মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় আমার উত্তর কাশীতে যাওয়ার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তুমি যাইতে দিলে না। নানা দিকে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া আমাকে ঢাকায় থাকিতে বাধ্য করিলে। তখন কিন্তু আমি তোমাকে খুব গালমন্দ করিয়াছি।

মা। (হাসিয়া) ভাল করিয়া গাল দিতে পার কই? দেখ, ঘরে ঢুকিবার দুই উপায়—এক হইতেছে দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করা, আর এক উপায় হইতেছে দরজার নিকট নিজকে শোয়াইয়া দেওয়া, অর্থাৎ দরজার নিকট নিজকে ভাঙ্গিয়া ফেলা।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মা বেড়াইতে বাহির হইলেন। আমরা যখন রাস্তায় বাহির হইলাম তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। মুশৌরীর পাহাড় আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া বড় সুন্দর

দেখাইতেছিল। দেখিয়া মনে হইতেছিল কে যেন গিরিরাজের গলায় হীরকের মালা পড়াইয়া দিয়াছে। উর্দ্ধে সুনির্ম্মল আকাশ, তাহাতে চাঁদের কিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে জগজ্জননী মা আমার হেলিয়া ছুলিয়া মরাল গমনে চলিয়াছেন। আমরা ধীরে ধীরে তাঁহার পদানুসরণ করিতেছি। আমার মনে হইতেছিল যে, শয়নে, জাগরণে, সংসারের সমস্ত কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে মাকে যদি এইরূপে পুরোভাগে রাখিয়া চলা যায় তবে সংসারে যে কাম্য আর কিছুই থাকে না।

ভ্রমরের শিবপূজা

কিছুক্ষণ বেড়াইয়া মা ফিরিয়া আসিলেন। আসা মাত্রই মাকে ভূগর্ভস্থ একটি গহ্বরে লইয়া যাওয়া হইল। বাড়ীর যে খণ্ডে মা আছেন সেই খণ্ডে ছুইটি গুহা দেখিতে পাইয়াছিলাম। মা'র সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি যে, গুহাটি ছোট হইলেও খুব ছোট নয়। ১৫।২০ জন লোক পাশাপাশি ইহার মধ্যে বসিতে পারে। গুহাটি ধূপগন্ধে পরিপূর্ণ। উহার মধ্যে ভ্রমর এবং লক্ষ্মীবাই পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। একটা বোতলের মধ্যে বেলগাছের একখানা ডাল স্থাপন করিয়া একটি ছোট বেলগাছ তৈয়ার করা হইয়াছে। গুহার এক কোনে একখানি কাষ্ঠাসনে ১০৮ মোমবাতি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ফুল, নৈবেদ্য ইত্যাদি সমস্তই প্রস্তুত। এসব দেখিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, এ সব কি?" মা বলিলেন, "ভ্রমর আজ তিন বৎসর যাবৎ শিবপূজা করিয়া আসিতেছে। এতদিন সে আপন ভাবেই পূজা করিত। গত লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন শাস্ত্রবিধি অনুসারে সে প্রথম পূজা করে। আজও আবার বিধিমত পূজা করিবে।

ভ্রমর মেয়েটিকে এই আমি প্রথম দেখিলাম। তাহার মুখে এমন এক দৃঢ়তা মিশ্রিত সরলতার ভাব আছে যাহা বাস্তবিকই অতি অপূর্ব্ব। মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লাগিল। সে যখন শুদ্ধবাসে শুদ্ধাসনে বসিল তখন আমার স্বতঃই মনে হইল যেন স্বয়ং পার্ব্বতী শিবারাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। মা পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং দুই একটি কথা বলিয়া তাঁহার বিষয়বুদ্ধির গভীরতার পরিচয় দিতেছিলেন। একটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত শিবপূজা করাইতে আসিলেন। ইনি জ্যোতির পিতা। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হইল। ইনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ পূজা কি নিত্যপূজার মত হইবে, না কোন সঙ্কল্প করিয়া হইবে। মা বলিলেন, "সঙ্কল্প করিয়াই হউক।" কথাটা শুনিয়া আমার একটু খট্‌কা লাগিল। নিত্যপূজা সাধনার একটা অঙ্গ বিশেষ, মা সে ভাবে পূজা করিতে না বলিয়া নৈমিত্তিক পূজার আদেশ দিলেন কেন? যাহা হউক প্রায় ১ ঘণ্টা কাল বসিয়া পূজা দেখিলাম। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে কতকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। সতীও ঝিমাইতে-ছিল। ইহা দেখিয়া মা আমাদিগকে বিদায় দিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন (২৮শে আশ্বিন ইং ১৫।১০।৩৫) সকাল বেলা উঠিয়া মা'র কাছে গেলাম। পৌঁছিয়া দেখি মাকে খাওয়ান হইতেছে। আজকাল মা একদিন পর একদিন আহার করেন। গতকল্য তাঁহার উপবাসের দিন ছিল। আজ তিনি আহার করিবেন। তাই সকাল বেলা হইতেই সকলে কিছু না কিছু হাতে করিয়া আসিতেছেন। কেহ বা আঙ্গুর, আপেল লইয়া আসিয়াছেন, কেহ বা দুধ-রুটি, কেহ বা সুধু মুখশুদ্ধির মশলা। সকলেই মাকে দিয়া ফলাদি প্রসাদ করাইয়া নিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে

আমরাও প্রসাদ পাইতেছি। মা হাসি মুখে আমাকে বলিলেন, "আজ আমার দপ্তর খুলিয়াছে।" আরও বলিলেন, "আমার কতকগুলি নাম হইয়াছে যথা "কালীখো" "আপীলেশ্বরী", "মানুষ-কালী" ইত্যাদি। কালীখো বলিয়া এক দেবী নাকি বিন্ধ্যাচলে আছেন। তাঁহার মূর্ত্তিটি হাঁ করিয়া আছেন। যাঁহারা উহা দর্শন করিতে যা'ন তাঁহারা কিছু না কিছু তাঁহার মুখে ফেলিয়া দিয়া আসেন। ভোজনের দিনও যাঁহারা মাকে দর্শন করিতে আসেন তাঁহারা মাকে কিছু না খাওয়াইয়া যা'ন না। উহা হইতে নাম হইয়াছে কালীখো। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম আপীলেশ্বরী হইল কেন?" মা বলিলেন, "এ নাম ভোলানাথ আমাকে দিয়াছেন। ঢাকাতে কোন বিষয়ের শেষ মীমাংসা করিতে হইলেই লোকে আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, সেইজন্য ভোলানাথ আমাকে আপীলেশ্বরী বলিতেন।"

জীব ভবিষ্যৎ জানিতে চাহে না

আজ ভ্রমরের সিঁথিতে সিন্দূর দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম; কারণ ভ্রমরকে আমি কুমারী বলিয়া জানি। পরে শুনিতে পাইলাম যে, গতকল্য শিবপূজার পর মা শিবের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছেন।

আমি। মা, তুমি নাকি শিবের সঙ্গে ভ্রমরের বিবাহ দিয়াছ?

মা। তুমি কোথায় শুনিলে?

আমি। আমি এইখানেই শুনিয়াছি। গতকল্য যখন তুমি সঙ্কল্প করিয়া পূজা করিতে বলিলে তখনই আমার খট্‌কা লাগিয়াছিল যে, তোমার মুখ হইতে এরূপ কথা কেন বাহির হইল?

মা। উহার (ভ্রমরের) ঐরূপ একটি সংস্কার ছিল। যখন ও পূজা করিতে বসিয়াছিল তখন পর্য্যন্ত জানিত না যে, উহার এরূপ কোন সংস্কার আছে; কিন্তু পূজা শেষ হইলেই উহার ঐ ভাবটি জাগিয়া উঠে, তখন আমি উহাকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দেই। এইরূপ সারদাকেও নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছি। সে কথা অন্য একদিন তোমাকে বলিব। বিবাহের পর ভ্রমরকে বলিলাম, "যদি তোর বিবাহের সংস্কার থাকে তবে পরে বিবাহ হইবে।" ইহা শুনিয়া ভ্রমর বলিল, "মা, তুমি বল যে, কোন দিন তুমি আমাকে বিবাহ করিতে বলিবে না।" আমি বলিলাম, "বেশ।" ইহার পর ভ্রমর আমাকে তাহার সিঁথিতে সিন্দূর পরাইয়া দিতে বলিল। সে বলিল, "মা, আমার সিঁথির সিন্দূর ত কখনই মুছিবে না, তবে তুমি কেন আমাকে সিন্দূর পরাইয়া দাও না?" ভ্রমরের এই অনুরোধের একটা ইতিহাস আছে—এই দেহটি যখন বৌ সাজিয়া ছিল, তখন গৃহস্থ বৌদের সমস্ত কর্ত্তব্যই ইহা পালন করিত। কোন স্ত্রীলোক যদি আমার সহিত দেখা করিতে আসিত, আমি তাহাকে পান খাইতে দিতাম এবং সিঁথিতে সিন্দূর পরাইয়া দিতাম। গৃহের মঙ্গলের জন্য গৃহস্থদের এ সব করিতে হয়। একদিন শ্যামলা* আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। আমি তাহাকে পান দিয়া সিঁথিতে সিন্দূর দিতে গেলাম, তখন শ্যামলা বলিল যে, যদি তাহার সিঁথির সিন্দূর

* ইনি ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত পণ্ডিতচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্ত্রী।

অক্ষয় থাকে অর্থাৎ সে যদি ঐ সিন্দূর লইয়াই মরিতে পারে, তবেই যেন আমি তাহাকে সিন্দূর পরাইয়া দেই, তাহা না হইলে আর কাজ নাই। আমি বলিলাম, "বেশ, তাহাই হইবে; কিন্তু আমাকে দিয়া জোর করিয়া আজ যদি এমন কাজ করাও তবে ইহার পর হইতে আমি কেবল তাহাদেরই সিন্দূর দিব যাহারা সধবা মরিবে। যাহারা বিধবা হইবে দেখিব তাহাদিগকে আর সিন্দূর দিতে পারিব না। আমাকে দিয়া কোন কাজ একভাবে আরম্ভ করিলে তোমাদের শত কান্নাকাটিতেও উহার পরিবর্ত্তন হইবার উপায় নাই। ইহার পর যদি কোন সধবা আমার নিকট আসে এবং আমি তাহার অদৃষ্টে বিধবা হওয়া আছে দেখিয়া যদি সিন্দূর না পরাই তবে তাহার প্রাণে যে হাহাকার উঠিবে তাহার বোঝা কে বহিবে? সে বোঝা যদি তুমি বহিতে সম্মত থাক তবে তোমার কথামত কাজ করিতে আমি রাজি আছি।" আমার এই কথা শুনিয়া আর আর সকলে বলিয়া উঠিল "না, মা, ওসব দিয়া কাজ নাই। তুমি যেমন সকলকে সিন্দূর পরাইতেছ সেই মতই পরাইতে থাক।" তাই, দেখ যে, জীব ভবিষ্যৎ জানিত চায় না। আমি ত তখন ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহা প্রকাশ করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু তোমাদের উহা জানিতে সাহস হইল কই? শূকর যেমন বিষ্ঠা খাইতে ভালবাসে জীবও তেমনি অজ্ঞানতা লইয়া থাকিতে ভালবাসে।

চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম আর দূর হইতে প্রণাম

আমি। মা, কেহ কেহ তোমার চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করেন এবং কেহ কেহ দূর হইতে প্রণাম করেন, এই দুই রকম প্রণামের মধ্যে পার্থক্য কি? মা শঙ্করানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "বাবাজী, তুমি বলত এই দুই প্রণামের মধ্যে কি পার্থক্য"। শঙ্করানন্দজী বলিলেন, "পা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে যাঁহাকে প্রণাম করা যায় তাহার ক্ষতি হয়, অর্থাৎ স্পর্শের জন্য তাঁহার শক্তিক্ষয় হয়।" মা কিন্তু একথা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, বাবাজী, যদি ডান হাত বাম হাতকে স্পর্শ করে, তবে বাম হাতের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি?"

মার কথার এই কি গূঢ়রহস্য যে, যাহারা তাঁহাকে প্রণাম করে তাহাদের হইতে তিনি আলাদা ন'ন, সমস্ত জীবজগত তাঁহার বিশ্বরূপের অংশ মাত্র? তবে মা একথা স্বীকার করিলেন যে, যিনি পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করেন তিনি বিশুদ্ধ বস্তু স্পর্শজনিত কিছু সুফল লাভ করেন।

আমি। তবে তোমাকে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করাই ভাল, কারণ অন্য কোন ফল লাভ হউক বা না হউক অন্ততঃ তোমার স্পর্শজনিত পুণ্য ত লাভ হইবে।

মা। কৃপা লাভ করিতে হইলে স্পর্শের কোন প্রয়োজন হয় না। উহা দূর হইতে লাভ করা যায়।

এই সব কথা উপলক্ষ্য করিয়া মা বলিতে লাগিলেন "কোন কাজ করা না করা সম্বন্ধে আমার নিজের ইচ্ছা নাই। সেইজন্য অনেক সময় আমি জ্যোতিষকে বলি যে, আমাকে দিয়া যদি কিছু

করাইতে হয় তবে মাঝে মাঝে যেন উহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। আমার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে হয়ত ঐ ইচ্ছানুযায়ী আমার কাজও হইয়া যাইবে।"

আমি। তাই কি, মা? তোমার ইচ্ছা না হইলে তুমি কি শুধু অন্যের কথায়ই কাজ কর? অপরের ইচ্ছা যখন তোমার ইচ্ছার সহিত মিলিত হয় তখনই তোমার নিকট হইতে কাজ পাওয়া যায়। তোমার হয়ত মনে আছে একদিন রমণার আশ্রমে ৺দীনেশবাবু * তোমাকে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিতে কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তুমি স্পর্শ করিলে কই? বোধ করি তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়াই তুমি স্পর্শ করিলে না।

মা। (হাসিয়া) আমি স্পর্শ করিলেই কি মৃত্যু বারণ হইত? যে মরিতে চলিয়াছে তাহাকেও আমি স্পর্শ করিয়াছি।" এই বলিয়া মা ৺নির্ম্মলবাবুর (স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জামাতার) মৃত্যুর বিবরণ দিলেন।

---

* ৺দীনেশচন্দ্র রায়। তাঁহার বাড়ী ঢাকা জেলা দাশরা গ্রামে। ইনি মা'র একজন পুরাতন ভক্ত ছিলেন। ময়মনসিংহে সবজজ থাকা কালীন ইনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হ'ন। উহার ফলে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ বিকল হইয়া যায়। এই অবস্থায় ৺দীনেশবাবু ছুটি লইয়া কিছুদিন ঢাকা আসিয়া বাস করেন। একদিন সকাল বেলা তিনি আশ্রমে মা'র নিকট বলিতেছিলেন, "মা, তোমাকে টাঙ্গাইলে একদিন আমার মাথায় হাত দিতে বলিয়াছিলাম, তখন যদি তাহা করিতে তবে আমার এ দশা হইত না। এখন একবার আমার মাথায় হাত দিবে কি?" মা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। দীনেশ বাবু আবার বলিলেন, "মা, যদি তুমি আমার মাথায় একবার হাত দেও তবে আমি তোমার নিকট আসি," এই বলিয়া তিনি চেয়ার হইতে উঠিতে গেলেন। মা কোমল অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "না, আসিও না।" মা'র এরূপ দৃঢ় ভাব আমি আর কখনও দেখি নাই।

নির্ম্মলবাবুর মৃত্যু

মা। যখন উত্তর কাশী হইতে ভোলানাথ মুশৌরী আসিয়াছিলেন, তখন নির্ম্মলবাবু আমার কাছে সস্ত্রীক আসে। আমরা যে ধর্ম্মশালায় থাকিতাম সেখানে তাহার থাকিবার জায়গা হইল না বলিয়া সে নিকটেই আর একটি বাড়ীতে জায়গা নিল। মুশৌরীতে আসিয়া নির্ম্মলবাবুর অসুখ হইল। আমি অসুখের প্রথমেই বলিলাম যে, ইহাকে যেন ভাল ডাক্তার দেখান হয়; কারণ অসুখে মরিয়া গেলে অনেকেই এই বলিয়া আক্ষেপ করে যে, যদি ভাল ডাক্তার দেখান হইত তবে বোধ হয় মারা পড়িত না। জ্যোতিষ বলিল, "মাত্র আজ অসুখ হইল, একজন হোমিওপ্যাথ্ ডাক্তার দেখান হইয়াছে। তাঁহার ঔষধের ফলাফল না দেখিয়া অন্য ডাক্তার ডাকা যায় কিরূপে?" ইহা শুনিয়া আমি আর কিছু বলিলাম না। নির্ম্মলবাবুর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। তাহার মাথায় রক্ত উঠিয়া গিয়াছিল। সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ দেখাইত। সে আমাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার স্ত্রীও আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বার বার লোক পাঠাইতে লাগিল, কিন্তু আমার কি হইল যে, আমি আর যাইতে পারিলাম না। ওদিকে যাওয়ার আমার কোন ইচ্ছাই হইল না। ৩।৪ দিন পর একদিন বিকাল বেলা হঠাৎ আমার মনে হইল এ সময়ে যদি কেহ আমাকে নির্ম্মলবাবুর নিকট যাইতে বলে, তবে আমি যাই। এই সময় ভোলানাথ আসিয়া আমাকে

নির্ম্মলবাবুর কাছে যাইতে বলিলেন। আমি অমনি তাঁহার সহিত নির্ম্মলবাবুর নিকট গেলাম। এতদিন নির্ম্মলবাবু বিকার ও অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। আমার যাওয়ার কিছু পূর্ব্বেই তাহার জ্ঞান হইয়াছিল এবং সে দুই একটা কথাও বলিতেছিল। আমি কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া রহিলাম এবং তাহার সহিত কথাও বলিলাম। পরে যখন চলিয়া আসি তখন আমার হাতখানা আপনা হইতে নির্ম্মলবাবুর মস্তক স্পর্শ করিল। ইহা কিন্তু কেহই লক্ষ্য করিল না। নির্ম্মলবাবুর কখনও ইচ্ছা ছিল না যে, তাহাকে ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হয়; কিন্তু রোগের গুরুত্ব দেখিয়া তাহাকে ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হইল এবং উহার পরই তাহার মৃত্যু হইল।"

ইহা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম নির্ম্মলবাবু কি ভাগ্যবান্! মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মায়ের মঙ্গলকরস্পর্শে জন্মমৃত্যুর চিরন্তন আবর্ত্ত হইতে মুক্ত হইলেন। মুখেও বলিলাম, "মা, নির্ম্মলবাবু ত বড় ভাগ্যবান্!"

মা। হাঁ, নির্ম্মলবাবুর যে গৃহে মৃত্যু হইয়াছিল তাহার ঠিক উপরের তলাতেই শিখদের গ্রন্থ সাহেব ছিল। একদিক হইতে ধরিতে গেলে ঐ গ্রন্থ সাহেব মাথায় করিয়াই নির্ম্মলবাবুর মৃত্যু হইল।

শ্রীশ্রীমা ও শ্রীযুক্ত রামঠাকুর

দেরাতুন আসিয়া মাকে মাঝে মাঝে "নারায়ণ" "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়া বলিয়াছিলাম, "মা, ঢাকাতে ত তোমাকে কখনও "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিতে শুনি নাই। এখানে আসিয়া এই প্রথম শুনিতেছি।"

মা। এখানে সন্ন্যাসীদের প্রণাম করিলে তাহারা "নারায়ণ" "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ করে। ঐ দেখাদেখি আমিও "নারায়ণ" বলিতে শিখিয়াছি। আমি বাচ্চা কিনা, যাহা শুনি তাহাই আওড়াই। আগে আমি দেখাদেখি কিছু করিতে পারিতাম না। একদিন রামঠাকুর আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলেন। দেখিয়াছ ত রামঠাকুর বয়সে বৃদ্ধ এবং একজন সাধক লোক। তিনি আমাকে প্রণাম করিলেন, আমি কিন্তু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলাম। একদিন প্রাণকুমারবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা রামঠাকুর তোমাকে প্রণাম করিলেন, তুমি ত তাহাকে প্রতিনমস্কার দিলে না? ইহাতে ঠাকুরের শিষ্যেরা না জানি কি মনে করিয়াছেন।" আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি সকলকে বলিও যে, বাবাজীর (অর্থাৎ রামঠাকুরের) চরণ সর্ব্বদাই আমার মাথার উপরে আছে।

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ

আমি। মা, শুনিয়াছি যে, দীক্ষাদাতা গুরু শিষ্যের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত নিজে মুক্ত হইতে পারেন না। এই কথাটি ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একটি উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন—রাখাল যেমন গরুগুলিকে একটি একটি করিয়া নদী পার করাইয়া পরে শেষ গরুটির লাঙ্গুল ধরিয়া নিজে নদী পার হয়, সেইরূপ গুরুও একটি একটি করিয়া সমস্ত শিষ্যকে পরিত্রাণ করিয়া শেষে নিজে মুক্ত হ'ন।

মা। এ কথা খুবই ঠিক। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধও একটা বন্ধন। গুরু শিষ্যের মঙ্গল কামনা করিয়াই এই বন্ধন সৃষ্টি করেন। এই

বন্ধন হইতে তাঁহাকেও মুক্ত হইতে হয়। যে পর্য্যন্ত শিষ্য মুক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত গুরুরও বন্ধন ঘুচে না। যাহা বলিলাম তাহা কিন্তু মুক্ত পুরুষদের বেলায় খাটে না। তোমরা কি পড় নাই যে পূর্ব্বকালে লোকে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ঋষিদের নিকট যাইত। ঋষিরা অধিকারিভেদে উপদেশ দিতেন। ঐ উপদেশ দিয়াই তাঁহারা কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ফেলিতেন। শিষ্যের সহিত আর কোনরূপ বন্ধনের সৃষ্টি করিতেন না।

আমি। তাঁহারা কি তবে শিষ্যের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিতেন না ?

মা। পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁহারা অধিকারিভেদে উপদেশ দিতেন, ঐ উপদেশই শক্তি-সঞ্চারের কাজ করিত।

আমি। মা, কেহ যদি গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া জপ-তপাদি না করে তবে কি সে কোন দিনই মুক্ত হইতে পারে না ?

মা। পুরুষকার চাই। দেখ না পাথরের মধ্যে আগুন আছে, কিন্তু না ঘষিলে আগুন দেখা যায় না।

আমি। আবার অন্য দিক হইতে দেখ, পাথরে যেরূপ আগুন আছে সেইরূপ কাঠেও ত আগুন আছে। দুইখানা কাঠ ঘষিয়াও আগুন পাওয়া যায়; কিন্তু একখানা কাঠ যদি জ্বালাইয়া দেওয়া যায় তবে আর কাঠে কাঠে ঘষিবার প্রয়োজন হয় না, তখন জ্বলন্ত কাঠখানাই অন্যটিকে জ্বালাইয়া দিতে পারে। সেইরূপ গুরু যদি মন্ত্রশক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করেন তবে আর শিষ্যের পুরুষকারের প্রয়োজন কি ? ঐ শক্তিবলেই ত সে মুক্ত হইতে পারে।

মা। কর্ম্ম থাকিতে গুরুশক্তি বুঝা যায় না। তাই কর্ম্ম শেষ করিবার জন্য পুরুষকারের দরকার। কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্ম শেষ করিতে হয়।

৺নিরঞ্জনবাবু * কি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?

আমি। মা, তুমি নাকি বলিয়াছ যে নিরঞ্জনবাবু শ্রীযুক্ত হরিরাম যোশীর ছেলেরূপে আবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?

মা। আমি বলি নাই, তবে জ্যোতিষ একদিন এখানে বসিয়া নিরঞ্জনবাবুর কথা বলিতেছিল। তখন হরিরামও এখানে ছিল। জ্যোতিষের কথা শুনিয়া হরিরাম হিসাব করিয়া বলিল যে, যে সময় নিরঞ্জনবাবুর মৃত্যু হয় সেই সময় তাহার একটি ছেলে জন্মে। এ ছেলে বোধ হয় সেই নিরঞ্জনবাবু।

আমি। বাস্তবিকই ঐ ছেলেটি নিরঞ্জনবাবু নাকি ?

মা। ঐরূপ একটি কথা হইয়াছিল।

আমি। তুমি কি বল ?

মা। (হাসিয়া) বাবাজী সব কথাই পাকা করিয়া নিতে চায়।

মার মুখ হইতে কথাটা বাহির করিতে পারিলাম না। তবে মনে হইল যে কথাটার মধ্যে হয়ত সত্য আছে।

---

* ৺নিরঞ্জন রায়। ইনি ইনকমট্যাক্সের ডেপুটী কমিশনার ছিলেন। ৺নিরঞ্জনবাবু ৺জ্যোতিষবাবুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং উভয়েই মায়ের অতি অনুগত ভক্ত ছিলেন। রমণায় আশ্রম স্থাপনের চেষ্টা প্রথমেই নিরঞ্জনবাবু করেন কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য উহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ৺জ্যোতিষবাবু তাঁহার 'মাতৃ-দর্শন' নামক পুস্তকে শ্রীশ্রীমায়ের পরলোকগত ভক্তগণের মধ্যে ৺নিরঞ্জনবাবুর নাম ও পরিচয় দিয়াছেন।

গুরুতে নির্ভর, শূন্যবাদ

আমি। মা, গুরুর উপর নির্ভর কি করিয়া আসে? এই নির্ভর আসিলেই সংসারযাত্রা অতি সুগম হইয়া যায়, তখন আর কোন ভয়ই থাকে না।

মা। একলক্ষ্য হইলেই গুরুর উপর নির্ভর আসিয়া পড়ে। সর্ব্বদা তাঁহার কথা চিন্তা করা, ধ্যান, জপ, নাম ইত্যাদি লইয়া থাকা, সর্ব্বদা এক ভাবে ভাবিত থাকিলেই এই নির্ভর আসে।

আমি। চিন্তা করিয়া যে নির্ভর আনা, তাহা আমি চাই না। সেরূপ নির্ভর কতকটা মনের বিকার বলিয়া সন্দেহ হইবে। কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই আমি ঐ নির্ভর পাইতে চাই। নামের শক্তি হইতে কি এই নির্ভর আসে না? নিজের চেষ্টায় অর্থাৎ চিন্তাদি দ্বারা কোন জিনিষ লাভ করিলে তাহা যে খাঁটি হয় না তাহার প্রমাণ আমার সেই গুরুভাইটি। তিনি ধ্যান করিয়া মনে করিলেন যে, তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার প্রকৃত সমাধি হইল না। তিনি প্রকৃত সমাধি লাভ করেন নাই তাহা তাঁহাকে বলিলেও তিনি বিশ্বাস করিবেন না।

মা। দেখ, একলক্ষ্য হইয়া থাকাই হইতেছে মনের স্বাভাবিক ভাব। চঞ্চলতা ও বিক্ষিপ্ততা হইতেছে মনের বিকৃত অবস্থা। আর তুমি তোমার গুরুভাইকে যত ছোট চোখে দেখিতেছ, বাস্তবিক সে তত ছোট নয়। মানুষ অনেক পুণ্যের ফলে এই অবস্থা লাভ করে। এ অবস্থাও একটা খুব উচু অবস্থা।

আমি। এরূপ অবস্থা আমি পছন্দ করি না। যিনি শাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন, গুরুকে বলেন মূর্খ, সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়া কথা বলিতে পারেন না, তাঁহাকে আমি খুব বড় মনে করি না।

মা। সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়া কথা বলা অতি দুর্লভ অবস্থা। বহু বহু পুণ্যফলে মানুষের এ অবস্থা হয়। তাহা ছাড়া বাবাজী যে অবস্থা লাভ করিয়াছে তাহাও অনেক ভাগ্যফলে লোকে লাভ করিতে পারে। তোমাকে কাল বলিয়াছি যে, বাবাজী এখন খণ্ডনের অবস্থায় আছে। সমস্ত সংস্কার খণ্ড খণ্ড করিয়া সে একলক্ষ্য হইয়াছে। তুমি দেখিতেছ যে, বাবাজী গুরুকে অশ্রদ্ধা করিতেছে, কিন্তু আমি বলি উহা রাগ বা অশ্রদ্ধা নয়, উহা অনুরাগ বা ভক্তিরই লক্ষণ। তত্ত্বই এখন বাবাজীর একমাত্র গুরু। ঐ তত্ত্বের প্রতি কাহারও অশ্রদ্ধা দেখিলে বাবাজীর রাগ হয়। এ অবস্থায় যে না পৌঁছিয়াছে সে ভাল করিয়া ইহা বুঝিবে না।

আমি। তিনি ত শূন্যবাদী, ভগবান্ ইত্যাদি তিনি কিছু মানেন না।

মা। শূন্যবাদ বলিয়াও ত একটা বাদ আছে। অনেক মহাপুরুষও ঐ পথে শান্তি লাভ করিয়াছেন; কাজেই ইহা হেয় হইল কিরূপে?

আমি। আমি এরূপ শূন্যতা চাই না।

মা। তুমি কি চাও?

আমি ভাবিলাম তাই ত আমি কি চাই? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "আমি সৃষ্টিস্থিতির সমস্ত রহস্য জানিতে চাই।"

মা। যে অখণ্ড শূন্যতা লাভ করে সে ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াই উহাতে প্রবেশ করে। শূন্যতা খণ্ড হইতে পারে আবার অখণ্ড হইতে পারে। বাবাজী (অর্থাৎ আমার গুরুভ্রাতা) এখন খণ্ড শূন্যতায় আছে। যে অখণ্ড শূন্যতা লাভ করে, বিশ্বের কোন রহস্যই তাহার নিকট গুপ্ত থাকে না।

যোগবিভূতি, ধর্ম্মের সহিত বিভুতির সম্বন্ধ

মা। কাল তোমাকে বলিয়াছি যে, কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব গ্রন্থি ভেদ হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ গ্রন্থিভেদের সঙ্গে যে কেবল নানা রূপাদি দর্শন হয় এমন নহে, অনেক অলৌকিক শক্তিও লাভ হয়। এই সব শক্তি খুব গোপন রাখিতে হয়। প্রকাশ করিতে গেলেই আর ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না এবং শক্তিও লোপ হইয়া যায়।

আমি। সকল সময়ই কি তাই হয়? কাশীর বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব যিনি আজ ৩০ বৎসর যাবৎ নানা প্রকার যোগ-বিভূতি দেখাইতেছেন, তাঁহার শক্তিক্ষয়ের ত কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।

মা। বাবাজীর কথা আলাদা, তাঁহার বিভূতির আর কি ক্ষয় হইবে?

আমি বাবা বিশুদ্ধানন্দের নিকট যে সব বিভূতির খেলা দেখিয়াছি তাহা কিছু কিছু বর্ণনা করিলাম। মা উহা শুনিয়া বলিলেন, "ঐ সব বিভূতি দেখিয়া তোমার কি লাভ হইবে? বাবাজীর নিকট তুমি ঐ সব

বিভূতি দেখিতে চাহিও না ; বরং বাবাজীকে বলিও তিনি যেন তোমাকে ধর্ম্মপথে কিছু অগ্রসর করাইয়া দেন।”

আমি। বাবার কাছে এ কথা বলিতে যাইব কেন? তুমিই উহা করিয়া দাও না? ছেলের আবদার মা'র কাছেই বেশী। তুমি আমার কি করিতেছ?

মা। (হাসিয়া) আমার যে এ সব কিছু করিবার শক্তি নাই। আমার ভিতরে কোন সংস্কারই নাই। যদি সংস্কার থাকিত, তবে আমি পারিতাম। কিন্তু বাবাজীর ভিতর সংস্কার আছে এবং বাবাজীর শক্তিও আছে।

মা'র এই কথা শুনিয়া আমি আর কিছু বলিলাম না। এরূপ কথা আজই যে মা'র কাছে প্রথম শুনিলাম এরূপ নহে। মা সর্ব্বদাই বলেন যে, তাঁহার কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই। যাহা হইবার তাহা আপনা হইতেই তাঁহার দেহের ভিতর দিয়া হইতেছে। লোকে কিন্তু এ ভাবটি ধরিতে পারে না, তাই মনে করে যে, মা কিছু করিবেন না বলিয়া ঐ কথা বলেন।

আমি। আচ্ছা, মা, বিভূতির সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি?

মা। তোমরা জাগতিক জ্ঞানের জন্য লেখাপড়া কর। লেখাপড়া শিখিলে তোমরা অনেক সময় কবিতা লিখিতে পার বা বক্তৃতা করিতে পার, অথচ ঐ কবিতা বা বক্তৃতা তোমরা কিন্তু কোন পুঁথি-পুস্তকে পাঠ কর নাই। কবিতা লেখা এবং বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদিতে যেরূপ বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেও কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হয়। বিভূতিগুলিই সেই লক্ষণ। এই জ্ঞান লাভ করিলে বিভূতি

আসিবেই আসিবে। বিভূতির প্রকাশ তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম, অধম। যদি বিভূতি স্বভাবের মধ্যে চলিয়া যায় তবে তাহাই হয় তাহার উত্তম প্রকাশ। বিভূতিতে স্থিতি লাভ করা হইল মধ্যম প্রকাশ। ইহাছাড়া অন্যরূপ প্রকাশ অধম।

আজ ২৮শে আশ্বিন আবার শ্রীশ্রীমায়ের আহারের দিন। আমরা প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলাম। দুপুরে একবার হোটেলে যাইয়া স্নানাদি কার্য্য শেষ করিয়া আসিলাম। চিন্তাহরণবাবু * মাকে ভোগ দিলেন। আমরা যখন প্রসাদ পাইতে বসিলাম তখন মাও একখানা চেয়ারে বসিয়া হাসিমুখে আমাদের ভোজন দেখিতে লাগিলেন। একাধারে মা অনন্ত স্নেহময়ী আবার সম্পূর্ণ অনাসক্তা।

আহারের পর আমরা মা'র কাছে গিয়া বসিলাম। নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর কে একজন আসিয়া বলিল যে, চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রী কাঁদিতেছেন। মা বলিলেন, "কাঁদিতেছে কেন ?" শঙ্করানন্দ স্বামীজী বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে বলিয়াছিলে তিনি কিছু কাজকর্ম্ম করিতে পারেন না চিন্তাহরণবাবু চাকুরীও করেন আবার ঘরের কাজও করেন, এই কথা বলিয়া জ্যোতিষবাবু ঠাট্টা করাতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "ইহাই জ্যোতিষের কাজ। ও এই রকম খোঁচাখুঁচি লইয়াই আছে।" ইহা শুনিয়া জ্যোতিষবাবু এবং আমরা হাসিতে লাগিলাম। চিন্তাহরণবাবুও ইহাতে যোগ দিলেন। মা বলিলেন,

* শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ সমাদ্দার, বাড়ী বরিশাল জেলায়। ইনি পুলিশ বিভাগে চাকুরী করেন। ছুটি লইয়া সস্ত্রীক মা'র সঙ্গ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইনি মা'র একজন পুরাতন ভক্ত।

"উহাকে (চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রীকে) আমার নিকট আন।" একজন চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রীকে ধরিয়া নিয়া আসিলেন। মা হাসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা তুমি কাঁদ কেন?" মা বার বার এই কথাই বলিতে লাগিলেন। চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রী কোন উত্তর না দিয়া আরও বেশী কাঁদিতে লাগিলেন। অবস্থা ভাল নয় দেখিয়া মা বলিলেন, "ইহাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল আনিয়া দাও। ইহার ফিট হইতে পারে।" কেহ জল আনিয়া দিবার পূর্ব্বেই চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রী উত্তরোত্তর ক্রন্দনের সুর চড়াইয়া ফিট হইয়া মার কাছে পড়িয়া গেলেন। মা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া রাখিলেন। এত যে ব্যাপার হইয়া গেল কাহারও উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নাই। সকলে যেমন ছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন। মা'র কাছে আসিলে এমনি একটি নিশ্চিন্ত ভাব সকলেরই হয়।

মা চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রীর সরলতার প্রশংসা করিলেন। চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রী চিররুগ্ন। সাংসারিক কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে পারেন না। তবে চিন্তাহরণবাবু বেশ পাকা লোক। তিনি সকলই চালাইয়া নেন। চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রীর বড় দুঃখ যে, তিনি ভাল করিয়া স্বামিসেবা করিতে পারেন না, বরং শরীরের জন্য তাহাকেই স্বামীর সেবা গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ নানা কথাই চলিতে লাগিল।

সংস্কারোপযোগী শিক্ষার দরকার

চিন্তাহরণবাবুর স্ত্রীর হিষ্টীরিয়া রোগ উপলক্ষ্য করিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "ইহার সংস্কার বেশ ভাল ছিল, কিন্তু উহা স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ পাইবার পথ না পাইয়া এই অবস্থায় আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে। ছেলেপেলেদের অনেক সময় ধর্ম্মসংস্কার থাকে। কিন্তু পিতামাতা তাহা বুঝিতে না পারিয়া জোর করিয়া তাহাকে অন্য পথে চালাইতে চেষ্টা করে। ফল সকল সময় ভাল হয় না। হয়ত ঐ সব ছেলেপেলের কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় তাহারা উন্মাদ হইয়া যায়। ছেলেমেয়েদিগকে ছোটকাল হইতেই ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া উচিত। তোমরা তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত যত্ন কর, যেন তাহারা বড় হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেও না। সে দিন একজন প্রোফেসার বর্ত্তমান সময়ের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম যে, এ সব সময়ের স্রোতেই হইতেছে। কিছুই অস্বাভাবিক নয়। পূর্ব্বে হিন্দুদের জীবন চারিটি আশ্রমে ভাগ করা ছিল। এখন সে সব কিছুই নাই; কারণ সকল আশ্রমের ভিত্তি যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম তাহাই লোপ পাইয়াছে। ইহার অভাবে বাকী আশ্রমগুলিও এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। পিতামাতার অসংযম সন্তানে বর্ত্তিয়াছে। এখন ছেলেপেলেরা অসংযমী বলিয়া দুঃখ করিলে চলিবে কেন? চাই ধর্ম্ম শিক্ষা। অর্থের জন্য ত শিক্ষা দিতেছই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষারও দরকার। (চিন্তাহরণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার মধ্যে বেশ একটা গোছান ভাব আছে। এই ভাবটা যদি ছোটবেলা হইতে ধর্ম্ম-পথে চালান হইত তবে ধর্ম্মসম্বন্ধে তুমি বেশ গুছাইয়া নিতে

পারিতে। কিন্তু উহা কেবল সাংসারিক বিষয়েই চালান হইয়াছে তাই সাংসারিক ব্যাপারে তোমার বেশ সাজান গোছান ভাব। (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) বাবাজীর মধ্যেও একটা শান্ত গম্ভীর ভাব ছিল। উহা ছোট বেলা হইতে ধর্ম্ম পথে চালান হইলে এতদিনে বাবাজী এ পথে বেশ একটা শান্ত ভাব লাভ করিতে পারিত। বাপ মা এখন ধর্ম্মের নামে ভয় পায়। মনে করে যে, ধর্ম্মশিক্ষা দিলে ছেলেপেলে বুঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, কতটি লোকের সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার আছে, আর কতটি লোকই বা সন্ন্যাসী হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। যাহার সন্ন্যাসী হইবার সংস্কার আছে তাহাকে শত চেষ্টা করিলেও সংসারে রাখা যাইবে না।

লাবণ্যের বাল্য-কথা,—স্পর্শমাত্রই শক্তি-সঞ্চার

সংস্কারোপযোগী শিক্ষার কথা বলিতে বলিতেই বাবা ভোলানাথের ভ্রাতুষ্পুত্রীর কথা মা উল্লেখ করিলেন। মা বলিলেন, "ভোলানাথের এক ভাইঝি ছিল। তাহার নাম লাবণ্য। ছোট বেলা হইতেই সে আমার খুব অনুগত ছিল। তাহার মা যদি তাহাকে চুল বাঁধিয়া দিত তবে তাহা তাহার পছন্দ হইত না। সে উহা খুলিয়া আমার কাছে চুল বাঁধিতে আসিত। তাহার ইচ্ছা ছিল যে, সে সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে থাকে; কিন্তু তাহার মা এতটা

মাখামাখি পছন্দ করিত না। লাবণ্য আমাকে মাঝে মাঝে বলিত, "তোমাকে আমার মা বলিতে ইচ্ছা করে।" তাহার মা'র নিকটও সে ঐ কথা বলে, তাহাতে তাহার মা ধমক দিয়া বলে, "খুড়ীকে আবার মা বলে না কি ?" যাহা হউক তাহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের অনেক দিন পর আবার আমার সঙ্গে তাহার দেখা হয়। তখন আমার অন্য এক অবস্থা। কীর্ত্তন শুনিলে এই দেহটা কেমন হইয়া যাইত, ভাবে এদিকে ওদিকে টলিয়া পড়িবার উপক্রম হইত। একদিন সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে কীর্ত্তন হইতেছে। আমি ভাবাবস্থায় দাঁড়াইয়া এদিকে ওদিকে টলিতেছি, এক একবার মাটিতে পড়িয়া যাইবারও উপক্রম হইতেছি। ইহা দেখিয়া লাবণ্য ভাবিল আমি বুঝি আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া ব্যথা পাইব; তাই সে আমাকে ধরিতে গেল। কিন্তু যেই আমাকে স্পর্শ করা, আর অমনি তাহার এক অদ্ভুত অবস্থা হইয়া গেল; মুখে কেবল "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে লাগিল আর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। অবশ্য তখন তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার কেহ ছিল না। সকলেই আমাকে লইয়া ব্যস্ত। এদিকে আমি ভাবাবেশে আশ্রম হইতে সিদ্ধেশ্বরী-বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছি। সকলেই আমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। লাবণ্য কিন্তু একাই আশ্রমে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছিল আর 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতেছিল। এইরূপে বহুক্ষণ গড়াগড়ি দিতে দিতে তাহার শরীর ধূলা কাদায় একাকার হইয়া গিয়াছে।

সহসা দেখিলে তাহাকে মানুষ বলিয়া চেনা যায় না। ইহার মধ্যে অখণ্ডানন্দজী (শশাঙ্কবাবু) কি এক কাজে আশ্রমে গিয়াছেন। সেখানে তখন জনপ্রাণি নাই তথাপি তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কোথা হইতে যেন "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনি আসিতেছে। তিনি চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। শব্দও খুব ধীরে ধীরে আসিতেছিল বলিয়া তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না যে, কোথা হইতে ঐ শব্দ আসিতেছে। কিছুক্ষণ এক মনে লক্ষ্য করিয়া তাহার মনে হইল যে, একটি মাটির স্তূপ হইতে যেন শব্দ আসিতেছে। তিনি নিকটে যাইয়া দেখিলেন উহা মাটির স্তূপ নয়, একটি মানুষ, ধূলা কাদা মাখা বলিয়া ঐরূপ দেখাইতেছিল। পরে জল দিয়া ধোয়া হইলে দেখা গেল সে আর কেহ নয়, আমাদের লাবণ্য। ততক্ষণ আমার ভাব ছাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু লাবণ্যের ভাব ছিল। তাহার মুখে কেবলই 'হরিবোল' ধ্বনি। এই ভাবে সে ২।৩ দিন ছিল। এই সব দেখিয়া লাবণ্যের মাতা বড় চিন্তিত হইল এবং আমার উপর রাগ করিতে লাগিল। সে বলিল, "এই জন্যই আমি ওকে তোমার কাছে যাইতে দেই না। এখন আমার মেয়ের কি হইল? তোমাকে ভাল করিয়া দিতে হইবে।" আমি বলিলাম, "মন্দ আর কি হইয়াছে? লাবণ্য ত কেবল হরিনামই করিতেছে।" ইহা শুনিয়া সে আরও রাগ করিয়া বলিল, "ও সব আমি বুঝি না। ওর ঘরসংসার আছে। এ সব করিলে ওর চলিবে কেন? উহাকে ভাল করিয়া দাও।"

এই গল্প শুনিয়া আমি বলিলাম, "মা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীতে পড়িয়াছি যে, মহাপ্রভুর ভাবাবস্থার সময় এক জেলে তাহাকে স্পর্শ করিয়া ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছিল।"

মা। সকলেরই এই অবস্থা হইতে পারে। ইহাতে উচ্চ নীচ বিচার নাই।

আমি। মা, ইহাকে শক্তিসঞ্চার বলে না?

মা একথার কোন উত্তর দিলেন না।

শশাঙ্কবাবুর সন্ন্যাসগ্রহণ

অন্যান্য কথার পর শশাঙ্কবাবুর সন্ন্যাসগ্রহণের কথাও উঠিল। শশাঙ্কবাবুর সন্ন্যাসগ্রহণের একটা ঝোঁক ছিল। তাহা ব্যতীত তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে মা মানসনেত্রে তাহাকে সন্ন্যাসীবেশে দেখিয়াছিলেন। তাই তিনি শশাঙ্কবাবুকে বিন্ধ্যাচল হইতে হরিদ্বারে ডাকাইয়া আনিয়া খুব অল্পসময়ের মধ্যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে আদেশ দেন। সন্ন্যাসগ্রহণের কোন আয়োজন ছিল না, এমন কি কাহার নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হইবে তাহাও অনিশ্চিত ছিল। মা স্বধু বলিলেন, "যদি অমুক দিনের মধ্যে তোমার সন্ন্যাস হয় তবেই হইবে তাহা না হইলে আর হইবে না। এখন তোমরা চেষ্টা কর" কর্ম্মবীর শঙ্করানন্দজী গুরু খুঁজিতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রথম একজনকে নির্ব্বাচন করা হইল, কিন্তু তাহার বয়স অল্প বলিয়া শেষে কন্‌খলের সুপ্রসিদ্ধ মঙ্গল গিরিমহারাজকে গুরুপদে বরণ করা হইল। তাঁহার নিকট হইতে শশাঙ্কবাবু বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে তিনি অখণ্ডানন্দ গিরিনামে অভিহিত হইতে

লাগিলেন। মা বলিয়াছিলেন, "ভালই হইল। বাবাজী গিরিসম্প্রদায় ভুক্ত হইল। ঢাকার আশ্রমও গিরিসম্প্রদায়ের।"

শুদ্ধভাবই প্রশস্ত ভোগ

অন্যান্য কথার মধ্যে মা আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "মা, তুমি আমার জন্য কি আনিয়াছ?" অর্থাৎ কলিকাতা হইতে আমরা মায়ের ভোগের জন্য কিছু আনিয়াছি কি না। এই সময় কথা হইতেছিল যে, কে কি আনিয়া মাকে ভোগ দেয়। আমার স্ত্রী বলিলেন, "মা, কিছুই ত আনি নাই।" মা বলিলেন, "তোমরা যে শুদ্ধ ভাব নিয়া আসিয়াছ তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট। উহা ছাড়া অন্য যাহা কিছু আমাকে খাইতে দিবে তাহা ত বাহির হইয়া যাইবে। তোমাদের শুদ্ধভাব ও শুদ্ধচিন্তা হইলে আমি খুব তুষ্ট হই।

সতীর শিবপূজা

আজ (২৯শে আশ্বিন ইং ১৬।১০।৩৫) আমার কন্যা সতীর শিবপূজার দিন। ভ্রমরের শিবপূজা দেখিয়া সতীর বয়স মাত্র আট বৎসর হইলেও সে শিবপূজা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। শ্রীশ্রীমাকে উহা বলিলে মা পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। গতকল্য স্থির হইয়াছিল যে, আজ স্বামী শঙ্করানন্দজী চিন্তাহরণবাবুর মেয়ের সঙ্গে সতীকেও শিবপূজা শিক্ষা দিবেন। ফুল, বিল্বপত্র সমস্তই এখান হইতে জোগাড় হইবে। আমাকে আর কিছু করিতে হইবে না। সকাল বেলা হোটেলে গরম জলে আমার স্ত্রী ও সতী স্নান করিয়া লইল। এখানে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসেই সকাল বেলায় এত শীত যে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করা একরূপ অসম্ভব।

আমরা মা'র কাছে পৌছিবার কিছু পরেই চিন্তহরণবাবুর স্ত্রী তাঁহার মেয়েকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। মেয়েরা পূজার জোগাড় করিয়া পূজার সময় মাকে ডাকিলেন। ভ্রমর যে গুহাতে শিবপূজা করিয়াছিল। মা'র সহিত আমরা সেই গুহায় গেলাম। স্বামী শঙ্করানন্দজী ইহাদিগকে পূজা করাইতে উদ্যোগ করিলেন। ভ্রমরের পূজার দিন মা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, আজও তথায় বসিলেন। সেদিন যেরূপ পূজাসম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন আজও সেইরূপ দিলেন। দেখিলাম বয়োবৃদ্ধ পক্ককেশ স্বামীজী হইতে এইসব বিষয়ে মা'র দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ। সতী ফ্রক পরিয়া পূজায় বসিয়াছিল। মা বলিলেন, "কাটা কাপড় পরিয়া পূজা করা যায় না।" তিনি সতীর জন্য একখানা কাপড় জোগার করিতে ভ্রমরকে আদেশ দিলেন। ভ্রমর সতীকে লইয়া গেল এবং একটু পরই কাপড় পরাইয়া আনিল। স্বামীজি পূজা আরম্ভ করিতে যাইতেছেন, মা আবার বলিলেন, "এক বস্ত্রে পূজা হয় না। ইহাদিগকে একখানা করিয়া চাদর দাও।" কোথা হইতে এই চাদর জোগাড় হইবে মা তাহাও বলিয়া দিলেন। এইসব দেখিয়া ভাবিলাম যিনি পূর্ণ, তিনি সকলদিকেই পূর্ণ। বৈষয়িক ব্যাপারই হউক, বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারই হউক মার চক্ষে সমস্তগুলি যেন এক পর্য্যায়ভুক্ত। এইজন্য বিজয় ব্যাস বলিয়া একটি ভক্তকে মা উপদেশ দিয়াছিলেন, "তোমরা যখন যাহা করিবে তাহা দেহ মন প্রাণ দিয়া করিবে। অযত্নে বা অসাবধান ভাবে কোন কাজ করিতে নাই।" ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যাপারভেদে চেষ্টাযত্নের তারতম্য মা'র অভিধানে নাই। নিজের জীবন হইতে নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়া মা এসব কথা ঢাকাতেও আমাকে বলিয়াছিলেন। সেইসব উপদেশ মা কেমন করিয়া কাজে ফলাইতেছেন এখন তাহা দেখিয়া সেগুলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে মেয়েদের পূজা চলিতে লাগিল। আমরা বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। দুই একটি করিয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন। দুইটি সুপুরুষও আসিলেন। তাহাদের মধ্যে যিনি বড়, লক্ষ্মীবাই যাইয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া দাড়াইলেন। আমি মনে করিলাম ইনি লক্ষ্মীর স্বামী। এ দেশীয় মেয়েরা হয়ত স্বামীকে সকলের সম্মুখে গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। মা আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীর বড় ভাই আসিয়াছে।" দেখিলাম ভাই-বোনের ভিতর ভাবটি বড় মধুর।

এই সময় অনেকগুলি স্ত্রীলোক আসিলেন। গুহাতে আর স্থান হইবে না দেখিয়া আমি গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মা আমাদিগকে ঐখানেই রুটি তৈয়ার করিয়া খাইতে বলিলেন। কিন্তু নানাপ্রকার অসুবিধা দেখিয়া মা'র অনুমতি লইয়াই আমরা হোটেলে চলিয়া আসিলাম। ভ্রমর কুমারীপূজা করিবে বলিয়া সতীকে রাখিয়া আসা হইল।

সত্যযুগ আসিতেছে

হোটেলে আসিয়া স্নানাহার শেষ করিয়া পুনরায় মা'র কাছে গেলাম। তথায় শুনিতে পাইলাম যে, গুহাতে যখন পূজা চলিতেছিল তখন উপস্থিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজনের কোলে একটি শিশু দেখিয়া মা তাহার নাম বটুক ভৈরব রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি মাকে বলিলাম, "মা, তুমি নাকি একটি ছেলের নাম বটুক ভৈরব রাখিয়াছ?"

মা। (হাসিয়া) মেয়েরা যখন পূজা করিতেছিল, তখন আমি কোলের ছেলেটি দেখিয়া বলিয়াছিলাম যে, কুমারীদের পূজা গ্রহণ করিতে বটুক ভৈরব আসিয়া উপস্থিত।

আমি। তুমি যে দেবদেবীর নাম এখন ছেলেমেয়েদিগকে দিতেছ তাহার কারণ এই না কি যে, দেবতারা আবার জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ?

মা। দেবতারা ত আছেনই, আবার জন্মগ্রহণ করিবেন কি ?

আমি। শুনিয়াছি সত্যযুগ নাকি আবার আসিয়াছে, কাজেই দেবতারা যে আবার জন্মগ্রহণ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

মা। সত্যযুগ এখনও আসে নাই, তবে শীঘ্রই আসিতেছে। উহা আমাদের সম্মুখে আছে এবং উহার আঁচ আমাদের গায়ে লাগিতেছে।

আমি। উহার আঁচ যে লাগিতেছে তাহা কি করিয়া বুঝিব ?

মা। সর্ব্বত্রই দেখিবে যে, সত্য কি তাহা জানিবার জন্য একটা পিপাসা জাগিয়াছে। ধর্ম্মের মধ্যে কিছু আছে কি না, পৈতা গ্রহণ করার উপকারিতা কি ইত্যাদি প্রশ্ন আজকাল ছেলেদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। এইসব লক্ষণ ভাল।

মা'র কথা শুনিয়া আমার C. F. Andrews এর কথা মনে পড়িল। তিনি তাঁহার What I owe to Christ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি নানা স্থানে ভ্রমন করিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে কোন স্থায়ী সত্য আছে কি না তাহা জানিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে সকলেই সর্ব্বত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। * যদি সত্যযুগ আসে তবে জগতের সর্ব্বত্রই আসিবে। তাই সত্য কি তাহা জানিবার জন্য এই উৎসুকতা।

---

* There are very many men and women in all countries, among the new generation, who are

দীক্ষা, বীজ, নাম

মা'র ওখানে পৌঁছিয়া আমি আরও শুনিলাম মা নাকি ছুই বেলা জপ করিবার জন্য সতীকে নাম দিয়াছেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, তুমি নাকি ছুই বেলা জপ করিবার জন্য সতীকে নাম দিয়াছ ?"

মা। হাঁ, নাম দিয়াছি তবে উহা দীক্ষা নয়।

আমি। দীক্ষা কাহাকে বলে ?

মা। গুরু যখন বীজ দেন তখন দীক্ষা হয়।

আমি। তুমি দীক্ষার সঙ্গে বীজ সংযুক্ত করিতেছ কেন ? কেবল নামে কি দীক্ষা হয় না ?

---

seeking to find a sure foundation for their Christian faith amid conflicting currents of modern thought. They fully understand the impossibility of building up the future structure of society on a purely material basis, and they have a deep reverence for the great spiritual achievements of the past. But at the same time they are unable any longer to bow down to traditional authority either in practice or belief. Their own conscience commands them to prove all things and to hold fast that which is good. They feel the need, almost desparately at times, of a personal Guide to lead them on their ways, and they are ready to offer devoted allegiance to One who is truely their Lord and Master. Yet they hesitate in honest intellectual bewilderment to surrender their heart to Christ".—Andrews.

মা। শিষ্যের বীজের সংস্কার থাকিলে গুরু দীক্ষার সময় বীজ দেন।

দীক্ষা সম্বন্ধে আর প্রশ্ন না করিয়া মা সতীকে কি দিয়াছেন তাহাই আমার জানিতে ইচ্ছা হইল। আমার বিশ্বাস যে, মা যদি সতীকে কোন নাম দিয়া থাকেন তবে উহাই আমি দীক্ষা বলিয়া ধরিয়া নিতে পারিব। কিন্তু আমি যতদুর জানি এ পর্য্যন্ত মা কাহাকেও কোন নাম বলিয়া দেন নাই। তাই আমি মাকে বলিলাম, "আচ্ছা, আমি যদি ওকে (অর্থাৎ সতীকে) কোন নাম জপ করিতে বলি, আর তুমি যদি উহাকে কোন নাম জপ করিতে বল, তবে এই দুই প্রকার বলার মধ্যে কোন প্রভেদ কি হইবে না? তোমার কথা ত শক্তিপূর্ণ।

মা। প্রভেদ ত হইবেই; তবে তুমি মনে করিও না যে, আমি উহাকে কোন নাম বলিয়া দিয়াছি। পূজা শেষ হইলে শঙ্করানন্দ উহাদিগকে এক নাম জপ করিতে বলে; তখন আমি উহাদিগকে বলি, 'তোরা ঐ নামই দুইবেলা জপ করিস্।'

আমি দেখিলাম যে, আমার অনুমান সত্য। মা নিজে নাম দিবার পাত্র নহেন। তখন আমি মাকে বলিলাম, "তুমি পালাইবার পথ রাখিয়াই সব কাজ কর।" মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "বাবাজী কেমন তন্ন তন্ন করিয়া প্রশ্ন করে!"

আমি। বীজ না পাইলে কি কেবল নামেই কাজ হয়?

মা। হাঁ, নামেই হয়। তোমরা কি দেখ নাই ছোট ছেলেপেলে 'মা' বলিতে পারে না; কিন্তু তাহারা যখন কাঁদে তখন মা জানিতে পারেন যে, ছেলে তাহাকে ডাকিতেছে। কিন্তু

ছেলে যখন বড় হয় তখন মাকে না ডাকিয়া যদি কাঁদিতে আরম্ভ করে তবে কিন্তু মা বুঝিতে পারেন না যে, ছেলে তাহাকে ডাকিতেছে। সেইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় আমরা যে নামেই ভগবানকে ডাকি না কেন তিনি তাহা জানিতে পারেন।

ছেলেমেয়েদিগকে ধর্ম্মপথে সাহায্য করা উচিত

ইহার পর মা সতীর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা কুমারী-পূজার সময় উপস্থিত ছিলে না, থাকিলে এক মজা দেখিতে পাইতে। ভ্রমর যখন ইহাদিগকে পূজা করিল তখন ওর (অর্থাৎ সতীর) মুখের দিকে চাহিয়া দেখি যে, এক দিব্য ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা অবশ্য পূজারই গুণ। তোমরা যদি ভাব দিয়া পূজা কর তবে যে ভাবে যাহাকে পূজা করিবে তাহার মধ্যে সেই ভাব ফুটিয়া উঠিবে। ওর পূজা হইয়া গেলে ও খুব খুসী হইল এবং হাসি হাসি মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমি রোজ রবিবার শিবপূজা করিব না কি?" ঢাকাতে কিন্তু ও আমার সহিত কখনও কথা বলে নাই, শুধু চুলের ফাঁক দিয়া মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাইত। কিন্তু আজ পূজার পর উহার লজ্জা কাটিয়া গেল এবং আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, "তোর যদি পূজা করিতে ইচ্ছা হয় তবে করিস। তবে শিবপূজার পক্ষে প্রশস্ত বার হইতেছে সোমবার।

তোর যখন স্কুলে যাইতে হয় তুই রবিবারেই পূজা করিস এবং বন্ধ পাইলে সোমবারে করিস।”

আমি। পূজা যদি করিতেই হয় তবে বল, আমি কাশী হইতে উহার জন্য একখানা বাণলিঙ্গ লইয়া যাইব। আমাকে ত কাশী যাইতে হইবেই।

মা। না, উহা তোমার করিতে হইবে না। বাণলিঙ্গ লইয়া গেলে প্রত্যহ পূজা করিতে হয়। উহার ত রোজ পূজা করিতে হইবে না। যেদিন ওর ইচ্ছা হইবে সেইদিন তোমরা পূজার যোগাড় করিয়া দিও। কোন বিষয়েই জোর করিতে নাই। যাহাতে আপনা আপনি সমস্ত জিনিষ ফুটিয়া উঠে তাহাই করিতে হয়। দেখ না, গাছে যে ফলটি পাকিয়া ফাটিয়া থাকে তাহা খাইতে সব চেয়ে মধুর। সেইরূপ ছেলেপেলের ভাল বৃত্তি-গুলি আপনা আপনি প্রকাশ পাইতে দেওয়া উচিত। পিতা-মাতার কর্ত্তব্য যাহাতে ওগুলি প্রকাশ পায় তাহার সাহায্য করা, পথ রোধ না করা। কা'ল তুমি উহার শিবপূজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলে। তখন আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম পূজা ত আগে হউক পরে দেখা যাইবে। এখন দেখিতেছ ও নিজেই পূজার বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে।

“আমার ইচ্ছা অপ্রতিহত”

আরও অনেক কথাই চলিতে লাগিল। কি একটা কথায় আমি মাকে বলিলাম “মা, যে যাহা করিতে না পারে তাহাকেও তুমি তাহা করিতে আদেশ কর।”

মা। এ কথা বলিতেছ কেন ?

আমি। ঢাকার আশ্রমে একদিন একটা কুলীকে কাঠালগাছের নীচে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নাম করিতে বলিয়াছিলে ; তুমি কি তখন জানিতে না যে, সে উহা পারিবে না। নলহাটীতে যখন ছিলে তখন তুমি অটল বাবুকে * তোমার কাছে আসিয়া থাকিতে বলিয়াছিলে, তখনও কি তুমি জানিতে না যে, অটল বাবু সংসার ছাড়িয়া আসিতে অক্ষম ?

মা। (হাসিয়া) তুমি সকল কথা জান না তাই এরূপ বলিতেছ। আমি যাহাকে যাহা করিতে বলিব, সে তাহা করিতে বাধ্য। তাহার এমন শক্তি নাই যে, সে উহা না করিয়া পারে। আমার ইচ্ছা অপ্রতিহত। ঐ যে কুলীর কথা বলিলে, সে আমার একটি আদেশের জন্য বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, "যাও, ঐ গাছের নীচে বসিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নাম কর।" ঐ আদেশ করিবার সময় আমি জানিতাম, সে উহা পালন করিতে পারিবে না। আর অটল বাবুর কথা কি তুমি শুন নাই ?

আমি। শুনিয়াছি, তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করে।

মা। অটল অনেক দিন হইতেই বলিতেছিল, "মা, আমার কিছুই ভাল লাগে না ; আমার ইচ্ছা করে যে, চাকুরী ছাড়িয়া আমি কোথাও একান্তে বসি।" আবার কখনও কখনও বলিত, "মা, তুমি যদি বল তবে আমি ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন

* শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ভট্টাচার্য্য এম্ এ। ইনি রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক এবং মা'র একজন অতি পুরাতন ভক্ত।

যাপন করি।" এইরূপ মাঝে মাঝেই আমাকে একটা আদেশ করিতে বলিত। ১৩৩৯ সনে যে উৎসব হয় তাহার ১ বৎসর পূর্ব্বেও সে চাকুরী ছাড়িয়া দিবার জন্য আমার আদেশ চাহিয়াছিল। তখন আমি তাহাকে এক বৎসরের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম। ১৩৩৯ সনের উৎসবে সে যখন ঢাকা আসে তখন আবার সে আমাকে বলিল, "মা, আমার কি এক বৎসর হইল না ?" আমি বলিলাম, "না, এখনও তোমার এক বৎসর হয় নাই।" বৎসর, মাস কিছু নয়। ভিতর প্রস্তুত না হইলে সময় কখনও হয় না। যা' হ'ক, ঐ সনের উৎসবের পর আমরা ঢাকা ছাড়িয়া আসিলাম। কিছুদিন এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আমরা নলহাটীতে গেলাম। তখন অটলকে নলহাটীতে আসিবার জন্য ভোলানাথকে একখানা টেলিগ্রাম করিতে বলিলাম, উদ্দেশ্য অটল যেন কোনরূপ ওজর আপত্তি করিবার সময় না পায়। তখন সে ছুটিতে ছিল। টেলিগ্রাম পাইয়া সে চলিয়া আসিল। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, সে কেবল তাহার দেহটা টানিয়া আনিয়াছে, তাহার মন, প্রাণ সবই রাখিয়া আসিয়াছে। অটল আসিয়া আমাকে বলিল, "এ সময় আমাকে ডাকিয়া আনা হইল কেন ? তোমরা কি জটলা করিয়াছ ? তুমি কি জান না যে, তোমার বৌমার শরীর ভাল নয় ? তাহাকে ফেলিয়া এ সময় আমি আসিতে পারি কি ?" তাহার এসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমি তাহার স্ত্রীর অসুখের খবর লইলাম এবং প্রশ্ন করিয়া

জানিলাম সে এখন পিত্রালয়ে আছে। আমি বলিলাম, "মাতাজী এখন বাপের বাড়ী আছে; সে ত ভালই আছে।" কিন্তু ইহাতে অটল প্রবোধ মানিল না। সে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তাহাকে এখানে আনা হইল কেন। আমি শুধু সংক্ষেপে বলিলাম, "তাহা দেখিতেই পাইবে।"

এদিকে ভোলানাথের ইচ্ছা যে, তিনি কিছুদিন বক্রেশ্বরে যাইয়া সাধন-ভজন করেন। সেই অনুসারে ঠিক হইল ভোলানাথ ও কমলাকান্ত বক্রেশ্বরে যাইয়া থাকিবে। অটল এই সব কথা শুনিয়া আরও অস্থির হইয়া পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল কমলাকান্ত যদি ভোলানাথের সঙ্গে যায়, তবে আমার কাছে হয়ত তাহাকেই থাকিতে হইবে এবং আমার সঙ্গে তাহাকে এখানে ওখানে ঘুরিতে হইবে। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একদিন বলিল, "মা, আমি কিন্তু তোমার কাছে থাকিতে পারিব না।" এ পর্য্যন্ত কিন্তু তাহাকে থাকিতে বলাও হয় নাই। সে নিজেই স্বীকার করিল যে, সে আমার কাছে থাকিতে পারিবে না। তাই, দেখিলে আমি অটলকে আমার কাছে থাকিতে আদেশ করি নাই। কিন্তু সে যে ত্যাগের কথা এতদিন বলিয়া আসিতেছিল ঘটনাচক্রে পড়িয়া বুঝিতে পারিল যে, ত্যাগ করিতে সে এখনও অক্ষম। এবার পূজার সময়ও তাহাকে এখানে আসিতে লেখা হইয়াছিল, কিন্তু সে উত্তর দিয়াছে, "এ অভাগাকে আর ডাকিবেন না। এ অভাগা বেশ আছে ইত্যাদি।"

আমি। নলহাটীতে তুমি অটলবাবুকে ডাকিয়া তাহার দর্পচূর্ণ করিয়া দিয়াছ এবং এই জন্যই তুমি তাঁহাকে ডাকিয়াছিলে? মা হাসিয়া মাথা নাড়িয়া উহা স্বীকার করিলেন।

উন্নত মহাপুরুষই লোকের সংস্কার বুঝিতে পারেন

অন্যান্য কথার পর মা শোগীবাবার গল্প বলিলেন। দেরাদুনের নিকট একটি জায়গা আছে সেখানে এক সাধু বাস করেন। ঐ স্থানের নাম হইতে সাধুটির নাম হইয়াছে শোগীবাবা। ঐ জায়গায় সাধুটির খুব সুখ্যাতি এবং তাঁহার অনেক ভক্তও আছেন। মা'র ভক্তদের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা যে, মা একবার সাধুটিকে দেখিতে যান। মা বলিলেন, "ইহাদের আগ্রহ দেখিয়া একদিন আমি সাধুকে দেখিতে রওনা হইলাম। এদিকে সাধুকে খবর না দিয়াই আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি এই ভাবিয়া দুই একজন খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িল, পাছে সাধু আমাকে অসম্মান করেন। ইহাদের মধ্যে একজন একটু আগে রওনা হইয়া সাধুকে আমাদের আগমন-সংবাদ দিতে গেল। সে যখন সাধুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল আমরাও যাইয়া তখনই উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সাধুটি বৃদ্ধ, পায়ের অসুখে কষ্ট পাইতেছেন। একজন ভক্ত তাঁহার পায়ে ঔষধ মালিশ করিয়া দিতেছে। আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া সাধু আমাকে বসিবার জন্য একখানা আসন দিতে বলিলেন। আমি আসনে বসিলে তিনি হামাগুড়ি দিয়া আমার

কাছে আসিয়া আমাকে প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "পতি ত্যাগ করিয়াছ কেন ?" আমি বলিলাম, "বাবা, আমি ত পতি ত্যাগ করি নাই। আমরা ঢাকা হইতে একত্রই বাহির হইয়াছি। আমার স্বামী নিজের কাজে স্থানান্তরে গিয়াছেন। আমি এখন আনন্দে একা বেড়াইতেছি।" আরও অনেক কথা হইল। আমরা যখন চলিয়া আসি তখন বাবাজী আমাকে একটা লাঠি দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার সহিত আমার অনেক প্রেম আছে, তাহা না হইলে এই লাঠি দিয়া তোমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিতাম।"

আমি। মা, সাধুটি কেমন ?

মা। বেশ ভাল, সে একভাব লইয়া সাধন করিতেছে।

আমি। তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া ত খুব উন্নত অবস্থার লোক বলিয়া মনে হয় না ; কারণ তোমাকে দেখিয়া তিনি কি বুঝিলেন না যে, তোমার কি অবস্থা ?

মা। লোক দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া যাঁহারা অবস্থা বুঝিতে পারেন, তাহাদিগকে খুব উন্নত মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে।

ইহার পর মা একটি লোকের কথা বলিলেন। তিনি নাকি কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুর আদেশে শিবপূজা করিতেছিলেন। এত কাল পূজা করিয়াও নিজের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার নিজের সাধনার উপর একটা অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়িল। একদিন তিনি শ্রীযুক্ত রামঠাকুর মহাশয়ের নিকট যাইয়া নিজের অবস্থা খুলিয়া বলিলেন। রামঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে একটি নাম দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন পূজা ত্যাগ করিয়া ঐ নাম করিতে

থাকেন। তখন লোকটি উভয় সঙ্কটে পড়িয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "যদি রামঠাকুরের আদেশে আমি পূজা ত্যাগ করি তবে গুরুবাক্য অমান্য করার জন্য আমাকে নরকগামী হইতে হইবে। আর পূজা যদি ত্যাগ না করি তবে মহাপুরুষের বাক্য অমান্য করার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এখন আমি কি করি?" এইসব চিন্তা করিয়া তাঁহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার আহার নিদ্রা ত্যাগ হইল এবং উন্মত্তপ্রায় একদিন ঢাকা আশ্রমে মা'র নিকট আসিলেন। মা তাহার নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, "দেখ, বাবাজী (অর্থাৎ রামঠাকুর) যদি সত্যই তোমাকে পূজাত্যাগের আদেশ দিয়া থাকিতেন তবে তোমার মধ্যে এই সকল সংশয় কখনও উপস্থিত হইত না। তাঁহার আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই তুমি পূজা ত্যাগ করিতে পারিতে। তোমার মনের সন্দেহই প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, বাবাজী সত্যসত্যই তোমাকে কোন আদেশ দেন নাই। আমি বলি, তুমি পূজা করিতে থাক এবং বাবাজী তোমাকে যে নাম দিয়াছেন তাহাও জপ করিতে থাক। ইহাতে কাহারও আদেশ অমান্য করা হইবে না।" মা'র কথায় লোকটির দুশ্চিন্তা দূর হইল এবং তিনি হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ

৩০শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার (ইং ১৭।১০।৩৫) জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির হইয়াছিল যে, পরদিন আমি শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ দিব। এই ভোগ দেওয়ার জন্য আমি কলিকাতা হইতে মাত্র ১ সের মুগের ডাল সঙ্গে

আনিয়াছিলাম অন্যান্য সমস্ত জিনিষ দেরাতুনেই জোগাড় হইল। জ্যোতিষবাবু দুধের বন্দোবস্ত করিলেন। খিচুরী, কপির তরকারী, লাব্‌ড়া, অম্বল এবং পায়সের আয়োজন হইল। ১ সের চাল এবং ১ সের ডালের খিচুরী হইল এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য জিনিষ হইল। কিন্তু এই সামান্য আহার্য্য যে কি ভাবে আমাদের এতগুলি লোকের তৃপ্তিসাধন করিল তাহা বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য। কারণ ২ সের চালডালের খিচুরী কখনও ১৩।১৪ লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। কাজে কিন্তু তাহাই হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি ব্যতীত ইহা কেহই লক্ষ্য করিল না। আমার লক্ষ্য করিবার কারণ এই যে, মা ভোজনে বসিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, "আমিই ত সব খাইয়া ফেলিলাম, অপরে কি খাইবে ?" মা'র ঐ কথাতেই আয়োজনের স্বল্পতার দিকে আমার লক্ষ্য পড়িল।

মায়ের ভোগের জন্য সকাল বেলা বাজার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই বাজার হইয়া গেলে তাড়াতাড়ি মার কাছে ফিরিলাম। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখি মা গুহার মধ্যে শুইয়া আছেন। আমি যাইয়া পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসিলাম। মাকে না দেখিয়া দুঃখ হইল। ভাবিলাম আজ আমার দেরাতুনে থাকিবার শেষ দিন আজ যদি মা'র সহিত আলাপ করিতে না পারি তবে আর আমার কষ্টের অবধি থাকিবে না। এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময় শ্রীশ্রীমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। আমি ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

মা যখন আসিয়া বসিলেন তখন আমি ভিন্ন নিকটে আর কেহ ছিলেন না। জ্যোতিষবাবু শ্রীযুতা সারদা শর্ম্মাকে দেখিতে গিয়াছেন।

আমি দেরাদুনে পৌঁছিয়াই শুনি যে, শ্রীযুতা সারদা শর্ম্মা আমাশয় রোগে খুব অসুস্থা। স্বামী শঙ্করানন্দ একদিন রাত্রি জাগিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া আসিয়াছিলেন। জ্যোতিষবাবু প্রত্যহই দুই একবার করিয়া দেখিয়া আসিতেছেন। এদিকে মেয়েরা মায়ের ভোগের রান্না লইয়া ব্যস্ত। মাকে একা পাইয়া আমি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

কি অর্থে গুরু শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ?

আমি। মা, আমার গুরুদেব মাঝে মাঝে শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" বাবা বিশুদ্ধানন্দও এই কথা তাঁহার শিষ্যদিগকে বলেন। তুমিও নাকি এরূপ কথা বল। এ সব কথার অর্থ কি ? কি অর্থে আমার গুরুদেব আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন ?

মা। এ সব কথা বাবাজীকে জিজ্ঞাসা কর নাই কেন ?

আমি। আমার যখন দীক্ষা হয় তখন আমি বালক। আর বাবা ত আমাকে এ কথা বলেন নাই যে, আমি অর্থ জিজ্ঞাসা করিব ?

মা। অনেক অর্থেই ঐ কথা বলা যায়। আচ্ছা আমি তোমাকে বলিতেছি। প্রথমতঃ বিষয়টি অখণ্ড ভাবে দেখ। গুরু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনু-পরমানু ব্যাপিয়া আছেন। এই অর্থে তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আবার বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, জগতে এক সৎ বস্তু আছে। তিনিই গুরু আবার তিনিই শিষ্য। গুরুশিষ্যে কোন ভেদ নাই। এই অর্থে গুরু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তা'ছাড়া গুরু মন্ত্ররূপেও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তারপর বিষয়টি খণ্ড ভাবে দেখিলে দেখা যায় যোগীরা

যোগবলে একই সময় বহু জায়গায় থাকিতে পারেন। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য গুরু যোগবলে খণ্ড ভাবে সমস্ত শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে পারেন। এ ভাবে ধরিলেও কথাটি সত্য।

মায়ের আত্মপরিচয়

মা খণ্ড, অখণ্ড ইত্যাদি কথা তোলাতে আমি প্রশ্ন করিলাম "মা, তুমি যখন অখণ্ড ভাবে থাক, তখন কি আমাদিগকে দেখিতে পাও?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া মা বেশ একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন। পরে বলিলেন, "দেখ, এ সব কথা আমি সকলের কাছে প্রকাশ করি না। সব কথা সকলের নিকট আমার মুখ হইতে বাহির হয় না। কিন্তু তোমাকে বলিতেছি। তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, আমার মুখ হইতেও উহার উত্তর বাহির হইতেছে। তুমি বুঝিবে বলিয়াই বোধ হয় এরূপ হইতেছে।

তুমি যে খণ্ড ভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি খণ্ড নহি। তুমি যে অখণ্ড ভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি অখণ্ড নহি। আমি অসীমও নহি, সীমার মধ্যে বদ্ধও নহি। আমি যুগপৎ উভয়ই। আমাকে যদি খণ্ড বল, তবে আমাকে সীমার মধ্যে বদ্ধ করা হয়; আবার আমাকে যদি অখণ্ড বল, তাহা হইলেও আমাকে বদ্ধ করা হয়। কিন্তু আমার সীমা নাই, বন্ধন নাই; আবার সমস্ত বন্ধনই আছে। আমি খাইতেছি, ঘুমাইতেছি, এগুলি আমার খণ্ড ভাব, কাজেই

আমি সসীম ; আবার আহার-নিদ্রার আমার কোনই প্রয়োজন নাই, কাজেই আমি সীমাশূন্য।

কোন ছেলেপেলে আমার কাছে আসিলে আমি তাহাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করি, তাহাদের মত একজন হইয়া যাই। আবার মহাপুরুষেরা যখন আমার কাছে আসেন তখন আমি তাঁহাদের ভাবেই তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলি। কত আত্মা, কেবল ভাল আত্মার কথা বলিতেছি না, কত খারাপ আত্মাও আমার কাছে আসে, তখন আমি তাহাদের ভাবেই তাহাদের সঙ্গে আলাপ করি। তাহাদের যাহা প্রয়োজন তাহা পূরণ করি। ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও আমি। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, আমি অখণ্ড ভাবে তোমাদিগকে দেখিতে পাই কিনা। আমি বলি, তোমরা কেন, যে আমাকে কখনও দেখে নাই, শুনে নাই, তাহার প্রয়োজন হইলে তাহাকেও আমি দেখিতে পারি ; তাহার অভাবও দূর করিয়া থাকি।

আমি। তাহা হইলে আমরা তোমার বিষয় চিন্তা করিলে তুমি আমাদিগকে দেখিতে পাও ?

মা। হাঁ, টর্চ্চের আলো ফেলিলে জিনিষগুলি যে ভাবে ফুটিয়া উঠে, তোমরা যখন আমার কথা চিন্তা কর তখন তোমাদের মূর্ত্তিও আমার মধ্যে সেই ভাবে ফুটিয়া উঠে। দেখ, জ্যোতিষের এখন বিচারের ভাব খুব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমি। মা, জ্যোতিষবাবুর ভক্তিও খুব।

মা। বিচার, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান এই চারিটি একত্রই থাকে। ইহার কোনটি অপরগুলি হইতে একটু বেশী ভাবে প্রকাশ পাইলে তাহা দিয়া আমরা মানুষের প্রকৃতি ঠিক করি। যাহাকে ভক্ত বলি তাহার মধ্যেও বাকী তিনটা গুণ আছে। কিন্তু ভক্তির ভাব বেশী বলিয়াই তাহাকে ভক্ত বলি। জ্যোতিষের এখন বিচারের ভাবটা বেশী। সে আমাকে অনবরতই পরীক্ষা করিতেছে। সেদিন করমপুর এক বাড়ীতে ইহারা আমাকে কীর্ত্তনে লইয়া গেল। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে আমার ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইল। সত্যসত্যই যে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল তাহা নহে, তবে জ্যোতিষ সর্ব্বদা আমাকে যে ভাবে দেখে তাহা হইতে আলাদা দেখিল। অপরে অবশ্য ইহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। কীর্ত্তন শেষ হইলে ফিরিবার পথে জ্যোতিষ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যদি অসীম হইবে তবে কীর্ত্তন শুনিয়া তোমার ভাব হয় কেন ?"

আমি। মা, কথাটা ত ঠিক হইল না। যদি প্রত্যেক বার কীর্ত্তন শুনিলেই তোমার ভাবের পরিবর্ত্তন হইত তবে ত বলা চলে যে, কীর্ত্তন দ্বারা তুমি সীমাবদ্ধ। তাহা না হইলে কি করিয়া কীর্ত্তনকে তোমার সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ?

মা। (সন্তুষ্ট হইয়া) তাই ত, কিন্তু জ্যোতিষ উহা ধরিতে পারিল না। এমন কতদিন গিয়াছে যে, আমি কীর্ত্তনে ঢলাঢলি করিয়াছি। আবার শতকীর্ত্তন শুনিলেও আমার ভাবের কোন

পরিবর্ত্তন হয় নাই। জ্যোতিষের কথা শুনিয়া আমি জ্যোতিষকে বলিলাম, "আমি যে ঘুমাই, আহার করি, কথা বলি, এ গুলি কি আমার সীমার চিহ্ন নয়? তুই এমন কি বলিবি যাহাতে সীমার চিহ্ন নাই?

আর একদিন আমি ও জ্যোতিষ বেড়াইতেছি তখন জ্যোতিষ বলিল, "আমি পূর্ব্বেই ভাল ছিলাম; খাইতাম, বেড়াইতাম, চাকুরী করিতাম, ইচ্ছা হইলে লোকের উপকার করিতে পারিতাম। তোমার পাছে পাছে ঘুরিয়া আমার কি হইল? তুমি কে? কেন তোমাকে লোকে খাওয়াইবে, পড়াইবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবে? এই ভাবে জ্যোতিষ বলিতে লাগিল।

আমি। তুমি কি উত্তর দিলে?

মা। আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমি কেবল হাসিলাম আর চুপ করিয়া রহিলাম।

আমি। মা, জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল তোমার জীবনী লেখা সম্বন্ধে। তাহাতে তিনি যে জবাব দিলেন উহা শুনিয়া এবং আজ তোমার এই সব কথা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যে, জ্যোতিষবাবু এখনও তোমাকে ঠিক ঠিক ধরিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "দেখুন, মা'র একটা জীবনী লেখা দরকার। আপনি সর্ব্বদা মা'র নিকট আছেন। আপনার ভক্তিও খুব এবং লিখিবার ক্ষমতাও অসাধারণ; এ অবস্থায় আপনারই মা'র জীবনী লেখা উচিত। ইহাতে জ্যোতিষবাবু বলিলেন, "মা'র ইচ্ছা না হইলে কিছুই হইবে না। তাহা ছাড়া আমার মনে হয় যে, মা শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবেন; কারণ

দেখা যায় যে, মা অনেক সময় নিজকে প্রকাশ করিতে যাইয়া আবার থামিয়া যান এবং বলেন যে, এখনও প্রকাশ করিবার সময় হয় নাই। আমার বিশ্বাস মা'র ইচ্ছা হইলেই তাঁহার জীবনী প্রকাশ হইবে।" জ্যোতিষবাবুর এই কথা শুনিয়া তখন অবশ্য আমি কিছু মনে করি নাই। কিন্তু আজ তোমার নিকট যাহা শুনিলাম এবং যাহা বুঝিলাম তাহাতে মনে হয় যে, জ্যোতিষবাবু তোমাকে ঠিক ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না।"

মা। তুমি কি বুঝিলে ?

আমি। তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যে, তুমি স্বপ্রকাশ, তুমি সৎ। এমন সময় ছিল না যখন তুমি ছিলে না ; এমন সময়ও আসিবে না যখন তুমি থাকিবে না। এখন যদি বলা যায় যে, তুমি মহামায়া, বা তুমি কালী, দুর্গা, মানুষী-মূর্ত্তিতে আসিয়াছ, তাহা হইলে ত তোমাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। ইহা ত তোমার প্রকৃত পরিচয় হইবে না। তুমি যে যুগপৎ অসীম ও সীমাবদ্ধ। কাজেই যে স্বপ্রকাশ তাহার আবার প্রকাশ কি ? পরিচয় কি ? এই নয় কি, মা ?

মা হাসিমুখে বেশ একটু জোর দিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা বুঝিয়াছ উহাই খাঁটি সত্য।"

মা'র কথা শুনিয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দের হিল্লোল খেলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কি একটা ভাব আসিয়া আমাকে অভিভূত করিতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম কত জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে ইঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি, ইঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেছি। অর্জ্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নিজের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, মা'র বর্ণনাও কতকটা সেইরূপ। মা'র কথা শুনিয়া আমি মাকে বলিলাম "মা, তুমি যে ভাবের কথা বলিলে ইহাকে পুরুষোত্তম ভাব বলে না ?" মা বলিলেন, "ইহা

তোমরা জান।” কাশীতে আসিয়া গোপীনাথবাবুকে মা'র ঐ সব কথাগুলি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা, এগুলি পুরুষোত্তম ভাবের কথা নয় ? গোপীনাথবাবু বলিলেন, “পুরুষোত্তম বই আর কি ?” যাহা হউক, মা ঐ সব কথা বলিয়া আবার বলিলেন, “তুমি খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্ন কর বলিয়া অথবা তুমি বুঝিবে বলিয়া তোমাকে এই সব কথা বলিলাম।”

আমি। মা, তোমার কথা সব বুঝিলাম বলিলে ভুল হইবে। তবে ইহা সত্য যে, উহা হইতে তোমার স্বরূপসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ যেন আভাস পাইতেছি।

মা। হাঁ, তাহাই।

এই সময় অন্য লোক আসিয়া পড়িল। আমাদের কথা বন্ধ হইল। এতদিন মাকে যে ভাবে দেখিয়া আসিতেছিলাম আজ যেন আর সে ভাবে দেখিতে পারিতেছিলাম না। বার বার কেবল গীতার কথাই মনে হইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—আমি ইঁহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিব ? কেমন করিয় প্রণাম করিব ? ইনি যে আমার অন্তরে বাহিরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। খণ্ড ভাবে দেখিলেও ইনি যে অখণ্ড, সম্মুখে দেখিলেও ইনি যে দূরে, অতিদূরে। ইনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য ; ইঁহাকে বাদ দিলে আমার সত্তা কোথায় ? আমি বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। মা'র সঙ্গে হাসিঠাট্টা করিয়াছি বলিয়া মনে মনে অনুতাপ হইতে লাগিল। হায় ! এতদিন আমি এই পুরুষোত্তমকে কি চক্ষেই না দেখিয়াছি। আর আজই কি আমি ইঁহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি ? বিন্দু আমি সিন্ধুর ধারনা করিব কি করিয়া ? ইচ্ছা হইতেছিল যে, অর্জ্জুনের মত কেবলই বলি—

“নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।”

অনেকক্ষণ এই ভাবেই কাটিয়া গেল। অন্য সকলে মা'র সঙ্গে কি আলাপ করিতেছিলেন তাহা আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। পরে লোক কমিয়া গেলে মা'র সঙ্গে আবার আলাপ আরম্ভ করিলাম। এইবার কাশীর খালিশপুরার মা'র কথা আরম্ভ হইল। মা আমার নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "ঐ মা'র বেশ উন্নত অবস্থা।" আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মনে করিও না যে, মেয়েরা ধর্ম্মবিষয়ে অগ্রসর হইতে পারে না। দেখ না আজকাল কত মা'র কথা শুনা যায়।" এমন সময় স্বামী শঙ্করানন্দ আসিয়া মাকে ভোজন করিতে ডাকিলেন। আমরাও মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার ভোজন দেখিতে লাগিলাম। মা'র ভোজন শেষ হইলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

সারদার বিবাহ

আহারের পর আবার যখন আসিয়া মা'র কাছে বসিলাম তখন মাকে বলিলাম "মা, সারদার বিবাহের গল্প বলিলে না?" মা বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে বলিতেছি।" এমন সময় তিন চারিটি স্ত্রীলোক মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। ইহা দেখিয়া আমি মা'র নিকট হইতে উঠিয়া মাঝের হলঘরে পায়চারি করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর শুনিতে পাইলাম মা বলিতেছেন, "বাবাজীকে ডাক, সেবার গল্প বলিতেছি।" মা সারদাকে "সেবা" বলেন। ঐ নাম মা-ই রাখিয়াছেন। ঐ নামের বোধ হয় সার্থকতা আছে। কারণ মা'র নিকট শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীযুক্তা সারদা শর্ম্মা লোকের সেবা করিয়াই পরম আনন্দ লাভ করেন। কাহাকেও কোন সাহায্য করিতে হইবে শুনিলে তিনি আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া তখনই ছুটিয়া যান। এমন কি মায়ের নিকট বসিয়া খুব গল্পগুজব করিতেছেন,

মা গল্প বলিয়া সকলকে খুব হাসাইতেছেন, এমন সময় যদি কেহ আসিয়া খবর দেয় যে, কোন প্রসূতির বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি অমনি গল্প বন্ধ করিয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া যান। এমনি তাঁহার সেবার ভাব। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় মা তাঁহার নাম "সেবা" রাখিয়াছেন। এইরূপ অনেককেই মা নূতন নাম দিতেছেন। স্বামী শঙ্করানন্দের অনেকগুলি নাম হইয়াছে যথা, "বশিষ্ঠ", "নারদ", "দুর্ব্বাসা"। যাহা হউক, মা'র ঐ কথা শুনিয়া কেহ আমাকে ডাকিবার পূর্ব্বেই আমি মা'র কাছে যাইয়া বসিলাম। মা সারদা দেবীর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দেরাদুনে শ্রীযুতা সারদা শর্ম্মা বলিয়া একটি লেডি ডাক্তার এবং তাঁহার ভগ্নি আছেন। ইঁহারা মায়ের কাছে খুব যাতায়াত করেন এবং মা'র খুব ভক্ত। মা বলিলেন, "সারদা মেয়েটি খুব ভাল। খাঁটি ব্রহ্মচারিণী বলিলে যাহা বুঝায় এ তাহাই। বয়স তাহার ৩২।৩৩ বৎসর হইবে কিন্তু এক দিনের জন্য ইহার মধ্যে কুভাব প্রবেশ করে নাই।" মেয়েটি খুবই সরল। মা'র সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে দেবদেবী বা ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অনুরক্তি দেখা যায় নাই। কিন্তু অন্যান্য গুণ যেমন সত্য-বাদিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদি তাঁহার খুব ছিল। এই দুইটি মেয়ে যখন মা'র নিকট আসিতেন তখন শক্তি বলিয়া একটি বাঙ্গালী মেয়ে প্রায়ই মাকে বলিতেন, "মা, এদের তুমি বিবাহ দিবে না?" মা তখন হাসিয়া বলিতেন, "আমি বরের চেষ্টায় আছি।" মা বলিলেন, "আমি অনেক বার সেবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি সে বিবাহ করিবে কি না; কিন্তু তাহার উত্তরে সে বলিত, "মা, আমি কি করিয়া বলিব? যদি বলি যে বিবাহ করিব না, পরে যদি কখনও বিবাহ হয় তবে ত আমার

কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে।” আবার কখনও কখনও সে নিজ হইতে বলিত, “মা, আমার একটি ছেলের খুব সাধ, তাহাকে আমি বি. এ, এম. এ পড়াইব।” এসব কথার মধ্যে যে লজ্জার কিছু আছে সে তাহা মনেই করিত না। এমন কি সে তাহার বাবার সহিতও নিজের বিবাহ সম্বন্ধে আলাপাদি করিত।

“একদিন সারদা ও তাহার বোন আমার কাছে বসিয়া আছে, তখন শক্তি আবার আমাকে বলিল, “মা, তুমি সারদাকে বিবাহ দিবে না?” তাঁহার কথা শুনিয়া আমি সারদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি, তুমি বিবাহ করিবে না?” সে দিন সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল “মা, তুমি সব জান। তুমি আমাকে যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।” আমি বলিলাম, “আমি যদি একটি মেথরকে বিবাহ করিতে বলি, তবে তুমি তাহা করিবে?” সে বলিল, “তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।” সারদার বোনকে যখন ঐরূপ প্রশ্ন করিলাম সে কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

“একদিন আমি সারদাকে ও প্রকাশজীর মেয়েকে এক একটি করিয়া ফুলের তোড়া দিলাম এবং বলিয়া দিলাম যে, আগামীকল্য তাহারা যখন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে তখন ঐ ফুলের তোড়া দুইটি যেন সঙ্গে করিয়া আনে। সারদা যত্ন করিয়া ফুলের তোড়াটি বাসায় লইয়া গেল এবং একটি ঘরে উহা রাখিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া দিল। প্রকাশজীর মেয়েও বাড়ী যাইয়া তোড়াটি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল, তবে সে ঘর তালা দিয়া বন্ধ

করিল না। পরদিন ভোর বেলা আমার নিকট আসিবার সময় সরদা যখন তোড়াটি আনিতে গেল তখন দেখা গেল যে, তোড়াটি নাই। ঘরের সমস্ত জিনিষই পূর্ব্বের মত আছে, তালাও ঠিক আছে, নাই কেবল ঐ তোড়াটি। প্রকাশজীর মেয়েরও ঐ ব্যাপার হইল। কি ভাবে যে তোড়া দুইটি অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। সারদা আমার নিকট আসিয়া বিরস বদনে বলিল যে, সে তোড়াটি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

"এইদিন সকাল বেলা আনন্দচকের * মন্দিরের পূজারী জীবের সংস্কার সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেছিলেন। সারদা উহা খুব মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল। পূজারী বলিতেছিলেন যে, জীবের সংস্কার থাকিতে মুক্তি নাই। ভোগ করিয়া ঐ সংস্কার শেষ করিবার জন্য তাহাকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই সব কথা শুনিয়া সারদা চিন্তা করিতে লাগিল যে, এত বড় ভয়ানক অবস্থা! যদি তাহার বিবাহের সংস্কার থাকে তবে জীবন ভরিয়া সাধন-ভজন করিলেও কেবল ঐ সংস্কারটি শেষ করিবার জন্য তাহাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। সারদা আমার নিকট তাহার এই সংশয়ের কথা বলিবার জন্য ব্যাগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। এইদিন সকাল বেলা যাহারা আমার

---

* এই ঘটনার সময় মা দেরাদুনে আনন্দচকে থাকিতেন। উত্তর কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনন্দচকে না থাকিয়া রাজপুর রোডে কৃষ্ণাশ্রমে বাস করিতেছিলেন।

সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে শক্তি মেয়েটিও ছিল। সে আমাকে বলিল, "মা, আমার বড় ইচ্ছা করে যে, আমি সারদার চুল বাঁধিয়া দেই।" আমি অনুমতি দিলে সে খুব যত্ন করিয়া সারদার চুল বাঁধিয়া দিল এবং কপালের মাঝখান দিয়া সিঁথি কাটিয়া দিল। এরূপ সিঁথি কিন্তু এদেশের বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে। এমন সময় প্রকাশজীর মা একটি ফুলের মালা লইয়া আসিল। সকাল বেলা সে কিন্তু কখনও আমার সহিত দেখা করিতে আসে না। এইরূপে বিবাহের সব আয়োজন হইতে লাগিল। একটু বেলা হইলে যখন সকলে বাড়ী চলিয়া গেল তখন সারদা আমাকে একাকী পাইয়া বলিল, "মা, পূজারী বলিতেছিলেন যে, জীবের সংস্কার ভোগ না করিলে না কি উহা কাটে না। আমি যদি বাকী জীবন সাধন-ভজন করি এবং আমার যদি বিবাহের সংস্কার থাকে তবে কি আমাকে কেবল ঐ সংস্কারটি শেষ করিবার জন্য আবার জন্ম লইতে হইবে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, তাহা ত হইবেই।" ইহা শুনিয়া সারদার বড় দুঃখ হইল। তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য আমি বলিলাম, "এস, এই জন্মেই তোমাকে নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দেই, তাহা হইলে তোমাকে সংসার করিতে হইবে না অথচ তোমার বিবাহের সংস্কার কাটিয়া যাইবে।" তাহার পর আমি সারদাকে বলিলাম, "এখন যাইয়া প্রথমেই শক্তিকে প্রণাম কর, কারণ এ বিবাহে সেই প্রধান উদ্যোগী।

আমি। তুমি ত কেবল বিবাহের কথা বলিলে, বিবাহ দিলে কই?

মা। "হাঁ, সারদাকে ঐ কথা বলার পর একটা কিছু হইল, উহা তোমার শুনিবার দরকার নাই। তারপর সারদা শক্তিকে প্রণাম করিতে গেল এবং যেই তাহাকে প্রণাম করিল অমনি সে ঘর হইতে সিন্দূর আনিয়া সারদার সিঁথিতে পরাইয়া দিল। কেন যে উহা করিল তাহা সেও বলিতে পারিবে না, কারণ তখন পর্য্যন্ত সারদার বিবাহের সংবাদ আমি ও সারদা ব্যতীত আর কেহ জানিত না। ইহার পর সারদার বিবাহের সংবাদ যখন প্রকাশ হইল তখন কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "নারায়ণ" নামে একটি ছেলের সঙ্গে সারদার বিবাহ হইয়াছে।" আবার কেহ বলিল, "না হে, এ নারায়ণ যে সাক্ষাৎ ভগবান্।" আবার কেহ কেহ আসিয়া আমাকে বলিল, "মা, আমাদিগকে সারদার বর দেখাও।" আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "দেখ, মানুষ-বর দেখিতে হইলেও তোমরা আঁড়ালে থাকিয়া তাহাকে দেখিতে কত চেষ্টা কর, সারদার বর দেখিতে হইলেও তোমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে, সাধন-ভজন করিতে হইবে। সাধন-ভজন কর নিশ্চয়ই তাঁহার দেখা পাইবে। যিনি সারদার পতি, তিনি তোমাদেরও পতি, তিনি বিশ্বের একমাত্র পতি।"

সারদার পুত্রলাভ।

সারদা দেবীর বিবাহের গল্প শেষ হইলে তিনি কেমন করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন সে গল্পও মা বলিলেন। মা বলিলেন, "একদিন

সন্ধ্যাবেলা সারদা, হরিরাম, লক্ষ্মী এবং অন্যান্য লোক আমার কাছে বসিয়া আছে, এমন সময় কি একটা বিষয় লইয়া সারদা ও হরিরামের মধ্যে বচসা আরম্ভ হইল। জ্যোতিষ এবং লক্ষ্মী মাঝে মাঝে দুই একটি কথা বলিয়া ঝগড়া আরও বাড়াইয়া দিতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া ইহাদের বচসা শুনিতেছিলাম। এমন সময় কে যেন বলিল, "তোমরা মা'র সম্মুখে ঝগড়া কর, তোমাদের লজ্জা করে না?" তাহার কথা শুনিয়া সকলেই চুপ করিল। পরদিন আমি হরিরামকে বলিলাম, "সারদা, লক্ষ্মী এবং তোমার মধ্যে গতকা'ল যে বচসা হইয়াছে, উহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমরা কুমারীপূজা কর। ইহা শুনিয়া সারদা প্রভৃতি খুব আনন্দে পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। এই পূজার সময় অনেকেই উপস্থিত ছিল। জ্যোতিও উপস্থিত ছিল। জ্যোতিকে কিন্তু কেহ পূজা দেখিতে ডাকে নাই। মাত্র অল্প কয়েক দিন হয় সে এম. এ. পাশ করিয়া এলাহাবাদ হইতে দেরাদুনে আসিয়াছে। পূজা শেষ হইলে আমি বলিলাম, "তোমরা ভগবতী পূজা করিলে এখন তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা কর।" এবং কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমি লক্ষ্মীকে বলিলাম, "দেবী এই বর দিলেন যে, আজ হইতে আমি তোমার মেয়ে হইলাম।" আর জ্যোতির হাত ধরিয়া আনিয়া আমি সারদাকে বলিলাম, "এই লও তোমার এম. এ. পাশ করা ছেলে।" এই সময় একজন প্রস্তাব করিল যে, সকলেরই একখানা ফটোগ্রাফ লওয়া

"দেখা গেল যে, ফটোখানিতে কুমারীকে আবৃত করিয়া একটি শিশুর চেহারা উঠিয়াছে।"

পৃঃ ১২৭

হউক। আমি বলিলাম, "যে, যে কুমারীর পূজা করিয়াছে সে সেই কুমারীকে লইয়া এক একখানা ফটো তোল।" তখন তিন খানা ফটো তোলা হইল। একখানিতে হরিরাম, হরিরামের কুমারী এবং আমি। দ্বিতীয় খানিতে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কুমারী ও আমি এবং তৃতীয় খানিতে সারদা, সারদার কুমারী ও আমি। দুইদিন পর ফটোগ্রাফার আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুইখানা ফটো ভালই হইয়াছে কিন্তু যে খানিতে সারদা, সারদার কুমারী ও আমি ছিলাম, ঐ ফটোখানার কুমারীর চেহারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে উহা হইতে কুমারীর চেহারাটা একেবারে উঠাইয়া দিয়া ফটোখানা দিতে চাহিল। আমি তাহাকে বলিলাম যে, সে যেন ফটোখানার কোনও পরিবর্ত্তন না করিয়া উহা যে ভাবে উঠিয়াছে ঠিক সেই ভাবেই আনিয়া দেয়। সে তাহাই করিল। দেখা গেল যে, ফটোখানিতে কুমারীকে আবৃত করিয়া একটি শিশুর চেহারা উঠিয়াছে। এই শিশু যে কোথা হইতে আসিল তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না।"

আমি। মা, ঐ ছেলে ত জ্যোতির ছোটবেলার চেহারা নয়?

মা। (হাসিয়া) তুমিই প্রথমে এই কথা বলিলে। এ পর্য্যন্ত একথা আর কেহ বলে নাই! (ভ্রমরের প্রতি) শুনিয়া রাখ বাবাজী কি বলে। অন্যান্য লোককেও ডাকিয়া মা আমার অনুমানের কথা বলিলেন। আমার মনে হইল যে, মা এতদিনে আমার মুখ দিয়া ঐ ছোট ছেলের প্রকৃত পরিচয় দিলেন।

এইসব আলাপ করিতে করিতে বেলা প্রায় ৪টা বাজিল। এমন সময় একজন ফটোগ্রাফার আসিলেন। ভ্রমর তাহার শিবলিঙ্গ লইয়া মা'র সহিত ফটো তুলিল। এই শিবলিঙ্গ (বাণলিঙ্গ) মা ভ্রমরকে দিয়াছিলেন। ইঁহার একটু বিশেষত্ব আছে। এই লিঙ্গের রং দিন দিন কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং ইহার মধ্যে মায়ের মূর্ত্তির মত একটি মূর্ত্তি যেন ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। দুইখানা ফটো তোলা হইল। একখানাতে মা ভ্রমরের গলা ধরিয়া দাড়াইয়াছেন। অন্যখানাতে ভ্রমর মায়ের কোলে বসিয়াছে। ভ্রমরকে মা "বড় মা" বলিয়া ডাকেন। তাহার প্রতি মায়ের কৃপার অন্ত দেখিলাম না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। মা বোধ হয় আজ আর বেড়াইতে গেলেন না। সন্ধ্যার পর আবার মা'র কাছে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম মা কাশ্মিরী এবং বাঙ্গালী বহু স্ত্রীলোকদ্বারা পরিবৃত হইয়া আছেন। নক্ষত্রমণ্ডলে চাঁদ যেরূপ শোভা পায়, এইসব সুন্দরী স্ত্রীলোকদের মধ্যে মাকেও সেইরূপ দেখাইতেছিল। মাকে আজ যেরূপ দেখিলাম এমন বোধ হয় আর কখনও দেখি নাই। শান্ত অথচ হাস্যময়ী মূর্ত্তি, মুখের জ্যোতিঃ যেন চতুর্দ্দিকে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে। একখানা এণ্ডির চাদর গায়ে জড়ান। শান্তসৌন্দর্য্য এবং শুভ্রতার যেন অদ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি।

মেয়েরা মাকে ভজন গান শুনাইতেছিলেন। সকলে পীড়াপীড়ি করাতে মাও একটি গান করিলেন। এ গান যে কত মধুর, কত দিব্য তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অতি মিষ্ট কণ্ঠে, ভাববিহ্বল নেত্রে ঢুলিয়া ঢুলিয়া মা গাহিলেন—

"হরিবল হরিবল হরি হরি বল
কেশব মাধব গোবিন্দ বল"

মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। মনে হইল আজ বুঝি স্বর্গ উজাড় করিয়া দেবতারা এই গান শুনিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যতক্ষণ মা গান করিতেছিলেন আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছিলাম। এমনি ভাবে নামগান করিতে পারিলে ভগবানের লুকাইয়া থাকা বোধ হয় সম্ভবপর হয় না। এই গানের স্মৃতি কখনও মুছিয়া যাইবার নয়।

মা বেশীক্ষণ গান করিলেন না। কিন্তু মেয়েদের গান চলিতে লাগিল। আগামীকল্য আমাদিগকে রওনা হইতে হইবে বলিয়া আজ বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত না থাকিয়া হোটেলে চলিয়া আসিলাম।

দেরাডুন হইতে বিদায়

১লা কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪২সন (ইং ১৮।১০।৩৫) আমাদের হরিদ্বার রওনা হইবার দিন। রাত্রিশেষে উঠিয়া মাকে দেখিতে গেলাম, ইচ্ছা যে, এই সময়ই বিদায় লইয়া আসিব। আমাদের গাড়ী বেলা ৯টার সময়, কাজেই দ্বিতীয় বার আর মা'র কাছে যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না।

স্বর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে মা'র কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও অন্ধকার আছে। দেখিলাম মা'র কাছে জ্যোতিষবাবু, স্বামী শঙ্করানন্দ, মৌনী মা, * লক্ষ্মীবাই, ভ্রমর ও এতদ্দেশীয়া দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়াছেন। শেষোক্ত দুইটি স্ত্রীলোকের একটি মা ও অন্যটি তাহার মেয়ে। মেয়েটি বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটিতে বি এ ক্লাশে পড়ে। ইঁহারা প্রত্যহই রাত্রি ৪টার সময় আসিয়া মাকে ভজন শুনাইয়া যা'ন। ইঁহারা আসিয়া

* ইনি শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বসু মহাশয়ের স্ত্রী। স্বামী এবং পুত্র বর্ত্তমান থাকিতেও ইনি সন্ন্যাসিনীর মত জীবন যাপন করিতেছেন। ইঁহার নাম শ্রীমতী মনোরমা বসু; মা ইহাকে "মৌনী মা" নাম দিয়াছেন।

গান ধরিলেই মা উঠিয়া বসেন। ভ্রমর মা'র কাছে শয়ন করে বলিয়া তাহাকেও উঠিতে হয়। এতে তা'র নাকি একটু কষ্ট হয়। মা একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "ভ্রমর আমাকে একদিন বলে, "মা, তুমি উহাদের গান শুনিয়া উঠ কেন? একটু শুইয়া থাকিলেও পার, তাহা হইলে আমিও একটু ঘুমাইয়া নিতে পারি। এত ভোরে যে উঠা যায় না।" আমি উহাকে বলি যে, উহারা আসিলে যে আমি আর শুইয়া থাকিতে পারি না।" আমরাও দেখিয়াছি যে, ব্যগ্রভাবে কোন দর্শনার্থী আসিলে মা কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। অন্য সময় হয়ত একঘর লোকের মধ্যেই মা কাপড়মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়েন। বাহ্যিক ব্যাপারে মা একেবারেই উদাসীন। মা'র কারবার কেবল মন লইয়া।

যাইয়া দেখিলাম জ্যোতিষবাবু চাপা গলায় স্বরচিত একটি গান গাহিতেছেন। গানটি বেশ ভাল লাগিল। ইহার পর সকলে মিলিত হইয়া ভজন আরম্ভ করিলেন। এ ভজনও যে কত সুন্দর তাহা না শুনিলে বুঝা যায় না। অন্ধকার ভাঙ্গিয়া অল্প অল্প আলো প্রকাশ পাইতেছে। সম্মুখে গাছের উপর দুই একটি পাখী ডাকিয়া উঠিতেছে। মা নিশ্চল ভাবে বোধ হয় মুশৌরীর পাহাড়ের দিকে চাহিয়া আছেন, দেখিলেই মনে হয় এ যেন ধ্যানরতা কোন যোগিনীমূর্ত্তি। রাত্রি ও দিবার সন্ধিক্ষণে কুহেলিকাচ্ছন্ন জগতের মধ্যে সঙ্গীতের তালে তালে যেন আলোকরেখা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। ঐ গান শুনিয়া স্বতঃই জগজ্জননীর পায়ে মনঃপ্রাণ লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। এই সুখের স্বর্গ ছাড়িয়া আজ চলিয়া যাইতে হইবে। বিশ্বজননীর জীবন্তবিগ্রহের নিকট আজ বিদায় লইতে হইবে ভাবিয়া চক্ষে জল আপনা হইতেই আসিতে লাগিল। আমি অতি

কষ্টে তাহা সংবরণ করিয়া নাম করিতে লাগিলাম। সূর্য্যোদয় হইল। জ্যোতিষবাবু মা'র নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। গান কিন্তু চলিতে লাগিল। আমিও মনে মনে মা'র নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। পরে মেয়ে ও স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া রওনা হইলাম। ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখি জ্যোতিষবাবু পূর্ব্বদিকের বারান্দায় বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আবেগভরে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। মা'র প্রতি অনাবিল ভালবাসা হইতেই তিনি মা'র প্রত্যেক ভক্তের প্রতি এইরূপ স্নেহশীল। আমি অতি কষ্টে তাঁহার সহিত দুই একটি কথা বলিলাম। চক্ষের জল লুকাইবার জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রওনা হইলাম। ভ্রমর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিল।

হোটেলে আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া রওনা হইবার যোগাড় করিতেছি এমন সময় জ্যোতিবাবু আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, "আপনারা আজই যাইবেন নাকি ?"

আমি। হাঁ।

জ্যোতি। মা'র সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন না ?

আমি। ভোর বেলা যাইয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছি।

জ্যোতি। তবে মা আমাকে এখানে পাঠাইলেন কেন ?

আমি যেন আরও শুনিলাম যে, তিনি বলিলেন, "মা আপনাদিগকে দেখা করিতে বলিয়াছেন।" আমি জ্যোতিবাবুকে বিদায় দিয়া বলিলাম, "আমি এখনই যাইতেছি।" বিদায় হইয়া আসার পর মা আবার ডাকিলেন কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক একখানা টাঙ্গা ডাকিয়া

সকলে আবার মা'র কাছে রওনা হইলাম। হোটেলের ম্যানেজারকে বলিয়া গেলাম তিনি যেন আমার 'বিল'টা প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

অতি শীঘ্রই মার কাছে যাইয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম মা যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াই সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি মাকে বলিলাম, "মা, আমাকে ডাকিয়াছ কেন ?

মা। (হাসিয়া) আমি ত ডাকি নাই। আমি ডাকিয়াছি বলিয়া জ্যোতি তোমাকে বলিয়াছে নাকি ?

আমি। হাঁ।

কিন্তু জ্যোতিবাবু এ কথা অস্বীকার করিলেন। আমি শুনিয়া অবাক হইলাম। সকলে হাসিতে লাগিলেন।

মা। তুমি সকাল বেলা চলিয়া গেলে আমি জ্যোতিষকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তুমি আজ যাইবে নাকি ? জ্যোতিষ বলিল, "হাঁ, অমূল্যবাবু বিদায় হইয়া গিয়াছেন।" জ্যোতিষের কথা শুনিয়া আমি আর কিছু বলিলাম না। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, বাবাজী (অর্থাৎ আমি) আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার একটু পরই জ্যোতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি যখন বলিলাম যে, তোমরা আজ যাইবে, তখন সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তবে আমি দেখা করিয়া আসি ?" আমি বলিলাম, "তোমার ইচ্ছা হইলে যাও।" তাহার পর যাহা হইয়াছে তাহা ত তুমিই জান। আমি দেখিয়াছিলাম যে, তুমি ঘুরিয়া আসিয়াছ, তাই তুমি আবার আসিয়াছ।

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। সকলেই তাহাতে যোগ দিলেন। বুঝিলাম মা'র ইচ্ছাতেই আমার আবার এখানে আসা হইয়াছে। কারণ মা নিজেই নাকি একদিন জ্যোতিষবাবুকে বলিয়াছিলেন, "আমি না টানিলে কাহার সাধ্য যে আমার কাছে আসে।"

আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

মা বলিতে লাগিলেন, "তোমরা দুজনেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছ। একে অন্যকে ধর্ম্মপথে চলিতে সাহায্য করিবে। স্বামিস্ত্রী দুইজন ভিন্ন পথের পথিক হইলে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তোমরা পরস্পরের সাহায্য করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে থাক।

"আর ঢাকার আশ্রমে যাইয়া বলিবে যে, তাঁহারা আমাকে যে দিন লইয়া যাইবে আমি সেই দিনই যাইব।"

আমি সজলনয়নে বলিলাম, "মা, আমরা যে তোমাকে নিতে পারি না। তুমি নিজ কৃপাগুণেই যাইও।"

মা আরও বলিলেন, "সকলকে বলিও, যে দিন যায় তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না; কাজেই ইচ্ছায়ই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক সকলেই যেন বেশী সময় নাম করিয়া কাটায়। এই আমার প্রার্থনা।"

আমি মাকে প্রণাম করিলাম। আমার স্ত্রী প্রণাম করিলে মা তাহার মুখ ধরিয়া আদর করিলেন। এমন সময় গোলাপজীকে * দেখিয়া আমি

---

* শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়না। ইনি দেরাদুনের উকিল। আনন্দচকে ইঁহার বাসা। ইঁহাকে মা "গোপালজী" নাম দিয়াছেন। গোপালজী এবং তাঁহার স্ত্রী মা'র খুব ভক্ত।

তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। এই ভক্তচূড়ামণি বৃদ্ধকে আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। তিনি আমাকে প্রণাম করিতে দিলেন না। আমার হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে আবদ্ধ করিলেন আর বলিলেন, "মা'র কৃপায় আমরা সব এক হইয়াছি।" আহা! এখানে মা'র ভক্তদের কেমন সরল মধুর ভাব! মা আমাদিগকে কোলাকুলি করিতে দেখিয়া বলিলেন, "এ (অর্থাৎ গোপালজী) প্রতিদিন কিন্তু এখানে এত বেলা পর্য্যন্ত থাকে না। আজ তোমার সহিত এই ভাবে দেখা হইবে বলিয়াই বোধ হয় আছে।"

আর আর সকলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া আমি টাঙ্গাতে আসিয়া উঠিলাম। এ ভাবে বিদায় হইয়া আসা যে কত হৃদয়বিদারক তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবে না। খুব শুভলগ্নেই ঢাকা হইতে এবার রওনা হইয়াছিলাম, তাই এই চারিটি দিন মা'র কাছে অতি আনন্দে কাটাইয়া গেলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মায়ের ঢাকা আগমন।

২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৪২ সন, (ইং ২১।১২।৩৫) বেলা ১২ টার সময় শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ মিত্র মহাশয় একখানি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার (ইং ১৩।১২।৩৫) শ্রীশ্রীমা ও বাবা ভোলানাথ ঢাকা আসিয়া পৌঁছিবেন। ইহা শুনিয়া বড় আনন্দ হইল। বুধ এবং বৃহস্পতিবার ভরিয়া সর্ব্বত্রই এক কথা যে, মা আসিতেছেন। সকলের মুখেই হাসি। সকলেই আনন্দে অধীর। মাকে দেখিবার জন্য লোকের যে কি আগ্রহ তাহা তাহাদের হাসিমুখ দেখিলেই বুঝা যায়।

মাকে অভ্যর্থনা করিতে আমরা নারায়ণগঞ্জ গেলাম। ষ্টীমার বেলা ১টা ১০ মিনিটে আসিয়া পৌঁছিল। মা ও বাবা ভোলানাথ জাহাজ হইতে অবতরণ করা মাত্র ভূপতিবাবু তাঁহাদের গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। আমরা ঢাকার গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। মা'র সঙ্গে এবার শ্রীমতী ভ্রমরও ঢাকা আসিয়াছিল। গাড়ীতে মা অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে অবশ্য কথা বলিলেন, কিন্তু কথাগুলি বড় আড়ষ্ট। এরূপ আড়ষ্ট কথা আর কখনও মা'র মুখে শুনি নাই। শুনিলাম দেরাদুন হইতে ফিরিবার পথেই মা'র কথা এইরূপ হইয়াছে। তিনি যেন অর্দ্ধসমাধি অবস্থায় আছেন। বড় ভয় হইল, পাছে মা মৌনী হইয়া যা'ন।

যাহা হউক গাড়ী ২॥ টার সময় ঢাকা পৌঁছিল। ঢাকা ষ্টেশনেও অনেক ভক্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা জয়ধ্বনি দিয়া মা ও বাবাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মোটর-গাড়ীতে

মা ও বাবাকে ষ্টেশন হইতে আশ্রমে লইয়া যাওয়া হইল। আমরা পদব্রজে আশ্রমে আসিলাম। আমরা আশ্রমে পৌছিয়া দেখি মেয়েরা মাকে এমন ভাবে বেষ্টন করিয়া আছেন যে, আমাদের মা'র নিকট যাওয়া একরূপ অসম্ভব। আমরা মাঠে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পর মা ও বাবা ভোলানাথ দাদামহাশয়ের (শ্রীশ্রীমা'র পিতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্যের) সহিত সাক্ষাৎ করিতে ৺ঈশ্বর ঘোষ মহাশয়ের বাগানের দিকে রওনা হইলেন। আমরাও অনুগমন করিলাম। বাগানে পৌছিয়া মা দাদামাশয়কে প্রণাম করিয়া পুকুরের ঘাট্‌লায় আসিয়া বসিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দ মাকে বলিলেন, "মা, তুমি দাদামহাশয়কে প্রণাম করিলে, দিদিমাকে ত প্রণাম করিলে না?" মা হাসিয়া বলিলেন "আমি উহা ভুলিয়াই গিয়াছি।" পরে দিদিমাকে প্রণাম করিলেন। মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া আমাদিগকেও প্রণাম করিলেন; এমন কি নিজের পায়ে মাথা নত করিয়া নিজকেও প্রণাম করিলেন। স্বামীজী আবার বলিলেন, "মা, প্রণাম ত প্রায় সবই পূর্ণ হইল, কেবল একটু অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। মা বলিলেন, "কি অসম্পূর্ণ রহিল?"

স্বামীজী। তুমি ভোলানাথকে প্রণাম কর নাই।

মা আবার আসিয়া ভোলানাথকে প্রণাম করিলেন। এ সবগুলি মা হাসি মুখে যেন খেলার ভাবেই করিলেন। আমি অবাক্ হইয়া মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মা আমাদের দিকে তাকাইয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

দিদিমার বাড়ী হইতে আশ্রমে ফিরিয়া মা মাঠে আসিয়া বসিলেন। একদিকে মেয়েরা বসিলেন, অন্যদিকে আমরা বসিলাম। একজন একজন করিয়া অনেক স্ত্রীলোক মাকে প্রণাম করিয়া যাইতে লাগিলেন। একটি

৩।৪ বৎসরের বালক মাথায় টুপি পরিয়া মা'র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং যোড়হাত করিয়া মাকে প্রণাম করিল। তাহার প্রণাম করার রকম দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম। মাও খুব হাসিলেন এবং খোকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি সাহেব হইয়াছ নাকি? একদম সাহেব হইয়াছ"।

দীর্ঘজীবনলাভ পুণ্যের ফল

এই সময় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী যোগেশবাবুকে সঙ্গে করিয়া আসিলেন। উভয়েই খুব বৃদ্ধ। যোগেশবাবুর স্ত্রী মার কাছে বসিলেন এবং মা'র হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া নিয়া বলিলেন, "আমার আর কতদিন ভোগ আছে? আমি ত মরিতে বসিয়াছিলাম আবার বাঁচিয়া উঠিলাম। তুমি বল, আর কত কাল আমার এই ভোগ আছে।"

মা। দীর্ঘজীবনলাভ পুণ্যের ফলে হয়। যত বেশী বাঁচিয়া থাকা যায় তত ভোগ কাটিয়া যায়। মৃত্যুচিন্তা করিতে নাই, বরং ভাবিতে হয় আমার ভোগ কাটিয়া যাইতেছে।

যোগেশবাবুর স্ত্রী। আমি বড় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। (ভূদেব-বাবুর স্ত্রীকে দেখাইয়া) আমার এই মেয়ে ও আর একটি মেয়ে আমার খুব সেবা করিয়াছে।

মা। সেবা করা ত মেয়েদের কর্ত্তব্য। নিজের সুখের জন্য ত তাহাদের জন্ম হয় নাই।

যোগেশবাবুর স্ত্রী। (যোগেশবাবুকে দেখাইয়া) আমি এখন এঁকে নিয়া আছি। দেখ না, আমি এঁকে কেমন সাজাইয়া দিয়াছি।

যোগেশবাবু অনতিদূরেই বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে কোট, পেণ্টালুন, মাথায় টুপি।

মা। (হাসিয়া) তুমি ওকেই তোমার গোপাল মনে করিও এবং এই ভাবে ইহাকে সাজাইও।

এইরূপে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। মা ঐ অস্পষ্টালোকে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীমতী ভ্রমর আসিয়া মাকে ভিতরে লইয়া গেল। মন্দিরে তখন আরতি হইতেছিল। আরতি শেষ হইলে আমরা প্রসাদ পাইতে আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন মা নামঘরে বসিয়াছিলেন এবং ছেলেরা কীর্ত্তন করিতেছিল। কীর্ত্তন বেশ ভাল লাগিতেছিল। তবে ভাবিতেছিলাম যে, ইহারা কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া মাকে একটু বিশ্রাম করিতে দিলে ভাল হয়, কারণ গতকল্য সকাল বেলা মা তারাপীঠ হইতে রওনা হইয়া আজ ঢাকা পৌছিয়াছেন। দিবারাত্রির মধ্যে বিশ্রাম হয় নাই। তাহাতে আবার মা উপবাসী। কাজেই এখন বিশ্রামের খুব দরকার।

গৃহাভ্যন্তরে শয়ন করিতে মা'র অনিচ্ছা

যাহা হউক কীর্ত্তন শেষ হইলে যখন মাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করা হইল তখন মা বলিলেন, "আমি ৬অন্নপূর্ণার মন্দিরের বারান্দায় শয়ন করিব।" অখণ্ডানন্দজী আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, ওখানে ব্রহ্মচারীরা শুইবে।

মা। তাহারা শুইলেও আমার জায়গা হইবে। আমি যখন একবার বলিয়াছি তখন আমি এখানেই থাকিব।

কিছুক্ষণ পর অখণ্ডানন্দজী মাকে আসিয়া খবর দিলেন যে, ভোলানাথ তাঁহাকে ডাকিতেছেন। মা তাঁহার কুটীরের দিকে চলিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম। যাইয়া দেখি এক বিষম ব্যাপার। বাবা ভোলানাথ বলিতেছেন মা কেন বাহিরে শুইবেন, ঘরে কি দোষ হইল ইত্যাদি, মা কোমল অথচ দৃঢ় ভাবে বলিতেছেন যে, তিনি বারান্দায়ই শুইবেন, কিন্তু কারণ বলিতেছেন না। বাবা ভোলানাথ মৌনী বলিয়া লিখিয়া লিখিয়া জানাইতেছেন যে, এই জন্যই তিনি ঢাকা আসিতে চাহিয়াছিলেন না। ঢাকা গেলে যে একটা গণ্ডগোল হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন এবং এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত মন্দিরের বারান্দায় শয়ন করিবার প্রস্তাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে (অর্থাৎ বাবা ভোলানাথের মনের ধারণা যে, মা আর গৃহে প্রবেশ করিবেন না। সন্ন্যাসিনী হইয়া পাহাড়ে পর্ব্বতে বেড়াইয়া বেড়াইবেন।) এমন কি তিনি রাগ করিয়া বলিলেন যে, মা যদি বারান্দায় শয়ন করেন তবে তিনি একদিকে চলিয়া যাইবেন। এই কথা শুনিয়া মা একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "চলিয়া যাইবে কেন? তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে চল বারান্দায় যাইয়া শুইবে, তাহা না হইলে এই ঘরেই শুইয়া থাক। জানই ত আমার খেয়াল। যখন আমার মনে হইয়াছে যে, আমি ঐ বারান্দায় থাকিব তখন আমাকে ঐখানেই থাকিতে হইবে। সকল সময় কারণ ত আমার মুখ হইতে বাহির হয় না। তবে জানিও যে, বিশেষ কারণেই আমি ঐখানে থাকিতে চাহিতেছি। (আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া) তোমরা ভোলানাথকে বলিয়া আমাকে বারান্দায় শুইবার অনুমতি লইয়া দাও।"

প্রমথবাবু। আমরা অনুমতি লইব কেন? তুমিই ভোলানাথকে সম্মত করাও।

ভোলানাথও সম্মত হইবেন না ; মাও তাঁহার জেদ ছাড়িবেন না। এই সময় গণেশবাবু বলিলেন, "মা, কৈলাসে হরপার্ব্বতীর মধ্যে এইরূপ ঝগড়া হয় নাকি ?"

মা। (গম্ভীর ভাবে) তুমি হরপার্ব্বতী দেখিয়াছ নাকি ?

গণেশবাবু। না, শুনিয়াছি।

মা। (পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে) শুনা কথা বলিতে নাই। আগে হরপার্ব্বতী দেখিয়া লও পরে বলিও।

যদিও মা এই কথাগুলি ধীর ও শান্তভাবে বলিলেন তবু মনে হইল যে, কথাগুলি যেন কশাঘাতের মত, মুখের উপর আসিয়া পড়িল। উহা শুনিয়া গণেশ বাবু কিংবা অন্য কাহারও সাহস হইল না যে, মা'র সঙ্গে পুনরায় লঘু ভাবে কথা বলে। এ সব আমার কিছুই ভাল লাগিতে ছিল না। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া নিশিবাবুকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। নিশিবাবুও * খুব চিন্তিত হইলেন। তিনি বলিলেন "তারাপীঠ হইতে যাত্রা করিবার সময় বাধা পড়িয়াছিল। কি যে অমঙ্গল হয় তাহা কে জানে ?"

আমি দেখিলাম বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও লাভ নাই। যত শীঘ্র এই ঘোর বিপত্তিসূচক বাদানুবাদের শেষ হয় ততই মঙ্গল। এই মনে

* শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মিত্র। ইনি মা'র অতি পুরাতন ভক্ত। এখন প্রায় সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিতেছেন। মা ইঁহাকে দেরাদুনে রায়পুরের মন্দিরে সাধন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

করিয়া আমি আবার মা'র কাছে যাইয়া বসিলাম এবং বাবা ভোলানাথকে বলিলাম, "বাবা, আমি একটি কথা বলিতে চাই।" ভোলানাথ আমার মুখের দিকে তাকাইলেন।

আমি। ইতিপূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে, মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিলে একটা অমঙ্গল হয়ই হয়। একবার পুরীতে রথযাত্রার সময় মা রথযাত্রা না দেখিয়াই পুরী হইতে রওনা হইতে চাহিয়াছিলেন, তখন মাকে বাধা দিয়া রাখা হয়, ফলে ৺নির্ম্মলবাবুর একটি ছেলে কূপে পড়িয়া মারা যায়।

বাবা ভোলানাথ ঘাড় নাড়িয়া উহা অস্বীকার করিলেন এবং ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার কথা না রাখার ফলে ঐরূপ হইয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়া বলিলেন যে, তিনি যে মাকে মন্দিরের বারান্দায় শুইতে বাধা দিতেছেন তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য, তাহাতে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ নাই।

আমি মাকে বলিলাম, "মা, তুমি বল যে, মন্দিরের বারান্দায় তুমি শয়ন করিলে আমাদের কোন অমঙ্গল হইবে না।"

মা। না, তোমাদের কোন অমঙ্গল হইবে না।

আমি। তুমি আরও বল যে, আজ যে ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছ না ইহার অর্থ এই নয় যে, ইহার পর তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়া এক দিক বলিয়া চলিয়া যাইবে।

আমার এই কথা শুনিয়া বাবা ভোলানাথ হাসিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে, তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই কথাই বলিয়া আসিতেছিলেন।

মা। আমি কোথায় চলিয়া যাইব ?

আমি। পাহাড়পর্ব্বতেও ত যাইয়া থাকিতে পার। তুমি কোথায় যাইবে তাহা আমরা কি করিয়া জানিব? তোমাকে না দেখিলে আমরা মনে করিব যে, আমরা তোমাকে হারাইলাম।

মা। এ সব কথা কেন উঠে? ঢাকা আসার কথা উঠিলে ইতিপূর্ব্বেও আমি বলিয়াছি যে, যদি আমার দেহ থাকে এবং তোমরা আমাকে ঢাকা নেও তবেই আমি যাইব। আমি যে মন্দিরের বারান্দায় শুইতে চাহিতেছি তাহার সহিত ভবিষ্যতে আমি কি করিব বা না করিব তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

ইহা শুনিয়া আমি বাবা ভোলানাথকে বলিলাম, "যখন মা বলিতেছেন যে, মা মন্দিরের বারান্দায় শয়ন করিলে অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা নাই, তখন আপনি আর বাধা দিবেন না। আপনি হাসিমুখে অনুমতি দিন।" কিন্তু বাবা তবুও কিছু আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। প্রমথবাবুও বাবার পক্ষ গ্রহণ করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। আমি একটু বিরক্ত হইয়া প্রমথবাবুকে বলিলাম, "আপনারা আর বাধা দিবেন না। মা যখন বলিতেছেন যে, তিনি মন্দিরের বারান্দায় শয়ন করিবেন তখন উহাতে কেহ অন্যথা করিতে পারিবেন না এবং অন্যথা করিলে ভালও হইবে না। আর মা ত বলিলেন যে, কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই।" যাহা হউক একরূপ স্থির হইল যে, মা বারান্দায় শয়ন করিবেন। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। মা যাইয়া মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। একটু পর আমি মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেই মা বলিলেন, "বাবাজী, এবার বিশুদ্ধানন্দ বাবাজীর সহিত দেখা হইয়াছিল। আমি মেয়ের মত সকল কথা বলিয়াছি।"

আমি। মা, আগামীকল্য তোমার নিকট সব কথা শুনিব।

মা। আচ্ছা, (একটু ভাবিয়া) কাল ত আসুক এবং কথা বলা ত হউক।

ইহা শুনিয়া আমার পূর্ব্বের সন্দেহ মনে জাগিল, মা কি তবে কাল মৌনী হইয়া যাইবেন?

আমি। মা, তবে আজই শুনিব।

মা। না, কালই শুনিও।

শঙ্করানন্দ। আগামীকল্য আমি মাকে স্মরণ করাইয়া দিব।

মা। তাহাই করিও।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, মা আজ বাবা বিশুদ্ধানন্দের সহিত সাক্ষাতের বিবরণ দিতে চাহিয়াছিলেন আমি বাধা দিয়া অন্যায় করিলাম নাকি? আগামীকল্য মা যদি সত্যসত্যই মৌনী হইয়া যান তবেত আর এ সকল কথা শুনিতে পাইব না।

অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর নিকট শুনিলাম যে, বাবা ভোলানাথের এবার ঢাকা আসিবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। মা অনেক বলিয়া তাহাকে সম্মত করাইয়াছেন। এমন কি রামপুরহাট ষ্টেশনে আসিয়াও বাবা বলিতেছিলেন, "তোমরা এঁকে (অর্থাৎ মাকে) লইয়া যাও। আমি এখানেই থাকি।" কিন্তু মা পূর্ব্বাপরই বাবা ভোলানাথকে সঙ্কল্পচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

পরদিন ২৮ শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪২ সন (ইং ১৪।১২।৩৫) খুব ভোরে উঠিয়া মা'র নিকট রওনা হইলাম। যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম তখনও একটু একটু অন্ধকার ছিল। যাইয়া দেখি মা ও ভ্রমর মন্দিরের বারান্দায় শুইয়া আছেন। দিদিমা মা'র কাছে বসিয়া আছেন। শুনিলাম মা নাকি

খুব ভোরে উঠিয়া মন্দিরের কুলদা দাদাকে * দুই একটি কথা বলিয়া আবার শয়ন করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে বাবা ভোলানাথ হাতমুখ ধুইয়া আসিলে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। এদিকে যতীনবাবু, রাধিকা বাবু প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন। কিন্তু মা তখনও শয়ন করিয়া আছেন। ইতিমধ্যে অখণ্ডানন্দজী প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসিয়া মায়ের জাগরিত হইবার অপেক্ষা না করিয়া মাকে প্রণাম করিতে গেলেন। স্বামীজী কম্বল সরাইয়া প্রণাম করিতেই মা উঠিয়া বসিলেন। স্বামীজীর কাণ্ড দেখিয়া বাবা ভোলানাথ ও আমরা হাসিতে লাগিলাম। বেলা হইতেছে দেখিয়া আমি মায়ের নিকট বিদায় লইতে গেলাম, কারণ আমাকে কলেজে যাইতে হইবে। মাকে প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, "তুমি ত আজ খুব ভোরে আসিয়াছ।"

আমি। তুমি যদি তাহা জান তবে এতক্ষণ কম্বলমুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলে কেন?

মা হাসিয়া উঠিলেন কিন্তু আর কিছু বলিলেন না।

কলেজের কাজ শেষ করিয়া আশ্রমে পৌঁছিতে বেলা প্রায় ১০টা হইল। মা আশ্রমের নামঘরে বসিয়াছিলেন, কিন্তু তখনই উঠিয়া আশ্রমের বাহিরে এক বৃক্ষের নীচে যাইয়া বসিলেন। আমি মন্দিরে প্রণাম করিয়া মা'র কাছে আসিয়া বসিলাম। মা তখন এক বৃদ্ধকে উপদেশ দিতেছিলেন।

---

* শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত বন্দোপাধ্যায়। ইনি P. W. D. আফিসে কাজ করেন। সংসার ত্যাগ করিয়া এখন আশ্রমে আছেন এবং অন্নপূর্ণামন্দিরে পূজাদি করেন। মা'র উপর ইঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস। একবার ইঁহার ছেলের কলেরা হইল। কুলদাবাবু কোন ডাক্তার ডাকিলেন না, বলিলেন, "মা রক্ষা করিলে ছেলে বাঁচিবে, না হয় ছেলে মরিবে।" ছেলেটি মারা গেল। কিন্তু মা'র উপর তাঁহার বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল।

মন স্থির হয় কিসে ?

বৃদ্ধটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন "মন স্থির হয় কিসে ?"

মা বলিতেছিলেন, "চঞ্চলতা মনের স্বভাব। সে স্বভাবতঃই এদিকে ওদিকে যাইতে চায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্বধন না পায়, শুদ্ধ ভাব না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সুস্থির হইবে না। এইজন্য স্বধন পাওয়ার চেষ্টাকে আমি সাধন বলি। মনকে স্থির করিবার জন্যই ত সাধনা। স্থির হইয়া গেলে ত হইয়াই গেল। মনকে স্থির করিতে হইলে এক ভাব লইয়া থাকিতে হয়, যেমন নাম করা, বা সদালোচনা করা, বা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা ইত্যাদি। যাহার যাহা ভাললাগে তাহা লইয়া বেশীক্ষণ কাটাইতে হয়।

বৃদ্ধ। নাম করিতে যদি মন এদিকে ওদিকে যায় তবে কি নামে কোন ফল হয় ?

মা। ফল হইবে না কেন ? তুমি চলিতে চলিতে যদি আগুণে পা দাও, তবে তুমি উহা দেখ আর না দেখ, তোমার পা পুড়িয়া যাইবে। সেইরূপ নাম তুমি এক মনেই কর বা অন্যমনস্ক ভাবেই কর উহার ফল থাকিয়াই যাইবে। অনেক সময় মনে হয় যে, নাম ত করি, কিন্তু কোন ফল ত পাই না। অবশ্য অনেক সময় আমরা নামের ফলাফল লক্ষ্য করিতে পারি না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার ফল থাকিয়াই যায়। আমাদের মধ্যে উহার একটা ছাপ পড়িয়া যায়। পরে বুঝা যায় যে, নাম করা বৃথা হয় নাই। তবে মন দিয়া নাম করা আর

অন্যমনস্ক ভাবে নাম করার মধ্যে পার্থক্য আছে। মন দিয়া নাম করিলে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। আর অন্যমনস্ক হইয়া নাম করিলে শীঘ্র ফল দেখা যায় না। তবে ফল থাকিয়াই যায়। সেইজন্য বলি যে, সর্ব্বদা নাম করা ভাল। সাংসারিক দিক্ দিয়াও দেখ না কেন, যে সাংসারিক বিষয়ে বেশী মন দেয় তাহার সাংসারিক জ্ঞান ভাল ভাবে প্রকাশ পায়। সেইরূপ শুদ্ধভাব লইয়া বেশীক্ষণ থাকিলে উহাতেও শুদ্ধ ভাব প্রকাশ পায়। তবে প্রথম প্রথম বেশীক্ষণ নাম করা যায় না, কারণ উহা ভাললাগে না। ছেলেপেলেও লেখাপড়া করিতে চায় না, কারণ লেখাপড়ার চেয়ে খেলাই উহাদের বেশী ভাললাগে। ছেলেপেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে হইলে যেমন জোর করিয়া তাহাদিগকে পড়াইতে হয়, সেইরূপ নামও প্রথম প্রথম জোর করিয়া করিতে হয়। চাই অভ্যাস। দেখ না বাসনপত্রে ময়লা জমিলে উহা পরিষ্কার করিতে ঘষিতে মাজিতে হয়। এক বার ঘষিলেই উহা পরিষ্কার হয় না। যতই ঘষামাজা করা যায় ততই পরিষ্কার হয়। দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইতে হইলেও ঘষিতে হয়; কখন যে উহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে তাহা বলা যায় না। নাম করাও সেইরূপ। অভ্যাস করিতে করিতেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যায়।

"মন এদিকে গেল ওদিকে গেল বলিয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। বরং তখন এই বলিয়া বিচার করিতে হয় যে, মন যখন আমার বাধ্য

না হইয়া এদিকে ওদিকে যাইতেছে, আমিও মনের বাধ্য না হইয়া জোর করিয়া নাম করিতে থাকিব। তোমরা দেখ না ছেলেরা ঘুড়ি উড়ায়। ঘুড়ি আকাশে এদিকে ওদিকে চঞ্চল ভাবে উড়িতে থাকে কিন্তু উহা বাঁধা থাকে নাটাইয়ের সূতার সঙ্গে। ঘুড়িটা হইতেছে মন। উহাকে নামরূপ সূতার সহিত বাঁধিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে বাঁধা থাকিলে একদিন না একদিন মনকে বশ করা যায়। চঞ্চলতা যেরূপ মনের স্বভাব আবার শান্ত হওয়াও উহার স্বভাব। উহাকে শান্ত করিতে হইলে একটা আশ্রয় করিতে হয়। তোমরা চাকুরীর জন্য এক এক জনকে আশ্রয় কর। সেইরূপ মুক্তির জন্যও নামকে আশ্রয় কর। প্রত্যহ অন্ততঃ তিন ঘণ্টা করিয়া নাম করা উচিত এবং ক্রমে ইহাকে বাড়াইতে হয়। যদি কোন দিন কোন কারণে তিন ঘণ্টা নাম করা সম্ভবপর না হয়, তবে যে সময়টুকু কম পড়ে অন্যদিন উহা পূরণ করিয়া নিতে হয়। এইরূপ একটা সঙ্কল্প করিতে হয় যে, আমি তিন ঘণ্টা হইতে ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া ৬ ঘণ্টা করিব এবং সেই অনুসারে চেষ্টা করিতে হয়। সকল কাজেই সঙ্কল্প চাই।

"ধর্ম্মলাভ করিতে অনেকে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে। গুরু বলিতে প্রকৃত পক্ষে আমরা ভগবানই বুঝি। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন এবং সকল সময়ই আছেন। উপদেশ সকল স্থানেই ছড়াইয়া আছে। কেবল কুড়াইয়া নিতে পারিলেই হয়। এই উপদেশ ভগবান্ নানা ভাবে দিতেছেন। গাছ, পশু ইত্যাদি

হইতেও আমরা উপদেশ লাভ করিতে পারি। এই অর্থে গুরু সর্ব্বব্যাপী।”

এইরূপে অনেক কথাই মা বলিতে লাগিলেন। শেষে বৃদ্ধটিকে বলিলেন, “বাবা, তোমার ত এখন অবসর, আমার কথা স্মরণ রাখিও। যে দিন যায়, উহা ত আর আসিবে না—আসিবে না। কাজেই সর্ব্বদা নাম করিতে চেষ্টা করিবে।”

ইহার পর বৃদ্ধটি চলিয়া গেলেন। কয়েকটি স্ত্রীলোকও মা'র কাছে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মাঝে মাঝে দুই চারিটি উচ্চাঙ্গের কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু কথাগুলির মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিল না। মা কিন্তু তাঁহার কোন কথারই উত্তর দিতেছিলেন না। শুধু মাঝে মাঝে হাসিয়া বলিতেছিলেন, “মা ত বেশ কথা বলিতে শিখিয়াছে।” আমরা নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিতে এতই মুগ্ধ যে, একটু ভাবিয়াও দেখি না আমাদের মুর্খতা কি পর্ব্বত-প্রমাণ! স্ত্রীলোকটি আবার আবদার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মা, আমার বড় সাধ যে তোমার প্রসাদ পাই। যদিও বাড়ীতে যাহা খাই উহাও তোমার প্রসাদ, তবু তোমার মুখের প্রসাদ পাইতে আমার বড় সাধ। আমার এ সাধ কি মিটিবে না?” এইরূপ দুই তিন বার বলিতেই মা বলিলেন, “বেশ ত, তুমি আশ্রমে থাকিয়া আজই প্রসাদ লও না কেন? (একটি স্ত্রীলোককে) যাও মা, তুমি বেশী করিয়া রান্না কর আমরা সকলেই প্রসাদ পাইব।” কিন্তু দেখা গেল যে পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটি প্রসাদের জন্য আর অপেক্ষা করিলেন না। বাড়ীতে রোগী আছে বলিয়া চলিয়া গেলেন। হায় রে! আমাদের কর্ম্মভোগ, কৃপা আসিলেও কৃপা বরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

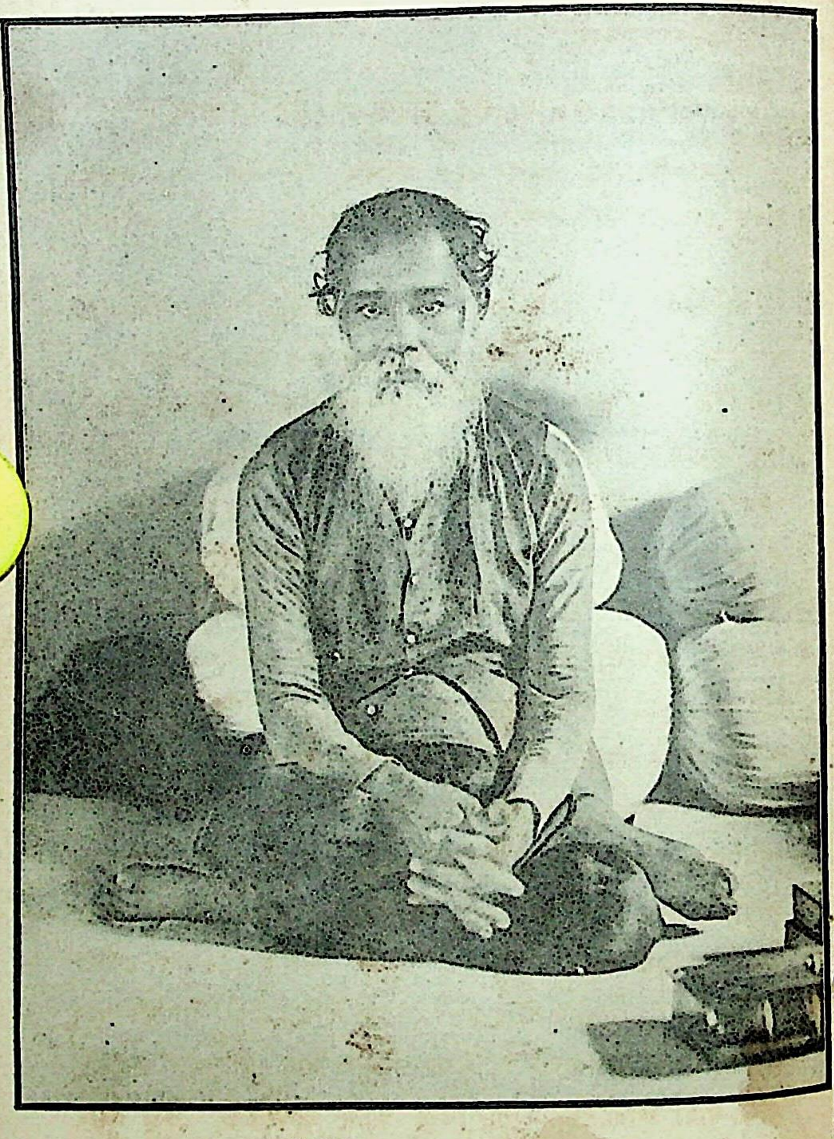

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

স্বামী বিশুদ্ধানন্দের সহিত মায়ের সাক্ষাৎ

স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেলে মাকে বলিলাম, "মা, বাবা বিশুদ্ধানন্দের সহিত যে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার বিবরণটা আমাকে বল।"

মা বলিলেন, "এবার ৺কাশী হইয়া যখন আসি তখন বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তবে বেশীক্ষণের জন্য নয়। হয়ত আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা হইবে। গোপীবাবু আমাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন। আমি যাইয়া বাবাজীর কাছেই বসিলাম। বাবাজী পূর্ব্বেই আমার বসিবার জায়গা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। জানই ত আমার কথা বলার ভঙ্গী। আমি বাবাজীকে আবদার করিয়া বলিলাম, 'বাবাজী, তুমি নাকি কত লোককে ম্যাজিক্ ট্যাজিক্ দেখাও, আমাকেও দেখাও না?" বাবাজী আমাকে বলিলেন, 'তুমি ত বেশ বসিয়া আছ। তুমি কি বাহির করিয়াছ?' আমি অমনি মেয়ে সাজিয়া গেলাম। বলিলাম, 'বাবা, আমি তোমার মেয়ে। আমি কি জানি? তুমি আমাকে যাহা শিখাইবে আমি তাহাই শিখিব। তোমার সব বিদ্যা আমাকে শিখাইয়া দাও না?' বাবাজী জ্যোতিষকে কাছে ডাকিয়া নিয়া একটি ফুলের পাপড়ি হইতে একটি স্ফটিক তৈয়ার করিয়া দেখাইলেন। নানারূপ গন্ধও তৈয়ার করিলেন। বাবাজী যখন এই সব দেখাইতেছিলেন আমি হাতে তালি দিয়া বলিলাম, "বাবাজী, তুমি যাহা করিতেছ তাহা কিন্তু আমি বুঝিতেছি, কিন্তু আমি

উহা বলিব না।” তখন সকলে আমাকে বলিল, ‘মা, বল না বাবাজী কি করিতেছেন ?’ আমি বলিলাম, ‘আমি যদি প্রকাশ করি, বাবাজী আমার মাথায় ডাণ্ডা মারিবেন।’ বাবাজী বলিলেন, ‘বেটি, তোকে আর এ সব কি দেখাইব ? তোর এ সব জানা আছে। আমি ইহাদিগকে দেখাইতেছি।’ পরে বাবাজী মিষ্টি কিনিয়া আনিয়া আমাদিগকে খাইতে দিলেন। বাবাজী আমাকে খাওয়াইয়া দিলেন। আমিও বাবাজীকে খাওয়াইয়া দিলাম। বাবাজী আমাকে বলিলেন, ‘বেটি, আমাকে মনে রাখিবি। ভুলিস্ না। আর যখন এখানে আসিবি আমার সঙ্গে দেখা করিবি।’ আমি আসিবার সময় গোপীবাবুকে বলিলাম, ‘দেখ, বাবাজী তোমাদিগকে এ সব দেখাইয়া ভুলাইয়া রাখিতেছেন। তোমরা ইহাতে ভুলিও না। বাবাজীর ভিতর আর আর যে সব জিনিষ আছে তাহা তোমরা বাহির করিতে চেষ্টা কর।”

বেলা প্রায় ১২টা বাজিল দেখিয়া আমি মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য বলিলাম, “মা, এখন উঠি।”

মা। কেবল উঠিতেই চেষ্টা করিবে আর নামিও না।

আমি হাসিয়া মনে মনে বলিলাম, “মা, তোমার আশীর্ব্বাদে যেন তাহাই হয়।”

বিকাল বেলা আশ্রমে যাইয়া দেখি ভবানীবাবু * পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঠ করিলেন।

* শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ নিয়োগী। ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

পুরুষকার, জীবভাব ও ব্রহ্মভাব

সন্ধ্যাবেলা মা একটু আশ্রমের বাহিরে মাঠে বেড়াইতে গেলেন। বেড়াইয়া আসিয়া মাঠেই একস্থানে বসিলেন। মা'র মুখে উপদেশ শুনিবার জন্য তখন উপায়-কল্পনা চলিতে লাগিল। গনেশবাবু একটি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন। এই প্রশ্নটি নাকি গতকল্য রাত্রিতে মতিবাবু * মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মতিবাবুও এই সময় আসিলেন এবং গতকল্য যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন উহাই আবার উত্থাপন করিলেন। প্রশ্নটি হইল এই যে, গতকল্য মা নাকি বলিয়াছিলেন যে, ভগবানকে পাইতে হইলে চেষ্টার দরকার। কিন্তু শুধু চেষ্টা করিলেই যে ভগবানকে লাভ করা যাইবে এমন কোন কথা নয়। এই পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে?

মা বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ লোকের মধ্যে চেষ্টা আছে, ততক্ষণ চেষ্টা করা আবশ্যক। যতক্ষণ চেষ্টার বুদ্ধি আছে ততক্ষণ চেষ্টা করিতেই হইবে। চেষ্টা করিতে করিতে বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ ভাব উদয় হয়। এই বিশুদ্ধ ভাবটা যে কি তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। যখন উহার উদয় হয় তখনই উহা বুঝা যায়। এই বিশুদ্ধ ভাব জাগিলেই লোকে বুঝিতে পারে চেষ্টা বা কর্ম্মের মধ্যে কোনও সার নাই। তখন সে ভগবানের হাতে পুতুলের মত হইয়া যায়। তিনি যে ভাবে নাচান সেই ভাবে সে নাচে।

---

* শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল রায়। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র। ইনি একজন ব্যারিষ্টার; সম্প্রতি ঢাকাতেই আইনব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

"এই বিশুদ্ধ ভাব জাগাইতে হইলে একটা পথ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। সে ভাবটা দ্বৈত ভাবেরই হউক কি অদ্বৈত ভাবেরই হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। "আমিই সব", "আমিই সব" অথবা "তুমিই সব", "তুমিই সব" এইরূপ একটি ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। এই ভাবে থাকিতে থাকিতে দেখা যায় যে, তখন আর দুইটি নাই। "আমি" আছে অথবা "তুমি" আছে। এক অখণ্ড সত্তায় তখন সব লয় পায়। ইহাই ব্রহ্মের অনুভূতি, ইহাই ভগবান্ লাভ করা। কথাতে ইহা প্রকাশ করা যায় না। উহা বুঝিবার জন্য শুধু লাভালাভ বলা। কথার মধ্যে আসিলেই উহা খণ্ড হইয়া যায়। ভাষা ত ভাসাই। সেই জন্য বলা হয় যে, জীব হইলে শিব হওয়া যায় না। জীবভাবটা কিরূপ না মাঠের মধ্যে বেড়া দিয়া ঘর করার মত। মাঠ ত পড়িয়া আছেই। বেড়া দিয়া ঘর করিলেও ঐ ঘরের ভিতরেও মাঠ, বাহিরেও মাঠ। আবার বেড়া ভাঙ্গিয়া দিলে যে মাঠ সে মাঠই। তাই বলি যে, লাভালাভ বলিয়া কিছু নাই। জীব ত স্বরূপতঃ ভগবান্। শুধু বন্ধনের জন্য তাহাকে জীব বলা হয়। বন্ধনটি খুলিয়া গেলে সে যে ভাগবান্ সেই ভগবানই থাকে। সেই জন্য আবার বলা হয় যে, যত জীব তত শিব। এই জীবভাবকে নদীর তরঙ্গের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। নদীর জলে ঢেউ উঠে। এই ঢেউগুলি জীব আর জল হইল ভগবান্। ঢেউ কিন্তু জলে উঠে এবং প্রকৃত পক্ষে উহা

জল বই আর কিছু নয়। সেইরূপ জীবের স্থিতি ভগবানে এবং প্রকৃত পক্ষে সে ভগবানই। তবে আমাদের ভেদবুদ্ধি আছে বলিয়া আমরা ঢেউকে জল হইতে আলাদা ভাবি। তাহা না হইলে ঢেউ ও জলের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। আমাদের অজ্ঞান কেবল প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে।

"তাহা ছাড়া সাধারণ ভাবে দেখিলেও মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যেও একত্ব, অসীমত্ব ও অব্যক্ত ভাব আছে। আমরা পাঁচ মিনিট কি চিন্তা করিলাম তাহার সব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। কি কি চিন্তা করিলাম তাহার অনেক কথাই অবশ্য বলিতে পারি, কিন্তু সব পারি না। ইহাতেই মনের অসীমত্ব প্রকাশ পায়। আবার এই অসীমত্বের মধ্যেও একত্ব আছে। যেমন আমরা একটা একটা করিয়া কথা বলি ; এক অক্ষর এক অক্ষর করিয়া লিখি ; এক পা এক পা করিয়া হাঁটি ; এক গ্রাস এক গ্রাস করিয়া খাই ; এইগুলি একত্বের লক্ষণ। আবার দেখ, আমাদের মধ্যে অবক্ত্য ভাবও আছে। আমরা বলি যে ফুলটি সুন্দর। কিন্তু কেমন সুন্দর তাহা ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। হয় ত উহা প্রকাশ করিতে যাইয়া অনেক কথাই বলি, কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ ভাবটা প্রকাশ হয় না। কিছু অব্যক্ত থাকিয়াই যায়। কাজেই জীবের মধ্যে ব্রহ্মের সমস্ত লক্ষণ আছে। তাই জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। ইহা

ব্যতীত জীবের মধ্যে আর একটি জিনিষ আছে যাহাকে আমরা বলি আনন্দ। জীব স্বভাবতঃই আনন্দ চায়। তাহার ভিতর এই আনন্দ আছে বলিয়াই ত সে উহা চাহিতে পারে। তাহা না হইলে সে উহা চাহিত না। সে আনন্দ না চাহিয়া থাকিতে পারে না। লক্ষ্য করিলে এই আনন্দ ও শান্তির আকাঙ্খা সমস্ত জীবের মধ্যেই দেখিতে পাইবে। পোকা, মাকড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীও তাপের দিকে যাইতে চায় না। তাহারা চায় শান্তি ও আরাম। রৌদ্রে তাপিত হইয়া জীবজন্তু চায় ছায়া। মানুষও সেইরূপ ত্রিতাপজ্বালায় তাপিত হইয়া শান্তির স্থল, আনন্দের আকর ভগবানকে খোঁজ করে। ত্রিতাপ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে অন্য তাপের সাহায্য নিতে হয়। তাপ দিয়াই তাপকে জয় করিতে হয়। একেই বলে তপস্যা। তাপ সহ্য করাকে আমি তপস্যা বলি। সংসারে তাপ ভোগ করাতে যেরূপ কষ্ট, প্রথম প্রথম ভগবানের নাম নেওয়াতেও সেইরূপ কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হইলেও এই কষ্ট দিয়াই ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কাজেই চাই চেষ্টা, চাই কর্ম্ম। পশুপক্ষীর মধ্যে এই ভগবান্‌কে পাওয়ার জন্য কোনও গরজ নাই। ইহা শুধু মানুষের মধ্যে আছে। জীবকে ভগবান্ অজ্ঞানের পরদা দিয়া ঢাকিলেও উহাতে আবার জ্ঞানের দরজা রাখিয়া দিয়াছেন। সে ঐ দরজা দিয়াই মুক্ত হইতে পারে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে পরমবস্তু পাইতে হইলে, ভগবানকে পাইতে হইলে জ্ঞান ও

অজ্ঞানের উপরে উঠিতে হইবে। যতক্ষণ জ্ঞান ও অজ্ঞান আছে, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায়, তখন সমস্ত ভেদজ্ঞান উহাতে লয় হয়।"

আমি। যদি জীব জলের তরঙ্গের মত হয়, তবে এই তরঙ্গ কে সৃষ্টি করিল?

মা। জল নিজেই তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে, ভগবান্ নিজেই জীব হইয়াছেন।

আমি। তবে কি জীবের কর্ম্ম-বন্ধন নাই?

মা। যতক্ষণ বন্ধনের জ্ঞান বা বুদ্ধি আছে ততক্ষণ বন্ধন আছে। এই বুদ্ধি চলিয়া গেলে কর্ম্মবন্ধনও দূর হয়। সবই ত ভগবানের ইচ্ছায় হইতেছে। ইহা অনুভব করিতে পারিলেই মুক্তি। আমি বলি, তুমি যে আজ ভগবানকে চাহিতেছ ইহাও ত তাঁহারই ইচ্ছা।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা; সদ্‌গুরুলাভ

একটি উকিল। মা, আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। গুরুর প্রয়োজন কি? সদ্‌গুরু কিরূপে লাভ করা যায়? গুরুবংশ লোপ পায় কেন?

মা। তোমরা ছেলেপেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতে মাষ্টার রাখিয়া দেও কেন? লেখাপড়া শিক্ষা দিতে যেমন একটি গুরুর দরকার, ধর্ম্ম বিষয়েও সেইরূপ একটি গুরুর দরকার।

উকিল। পুস্তকেই ত সব লেখা আছে, আবার গুরু কেন?

মা। এ পুস্তক নিজে পড়া যায় না। বাহিরের পুস্তক পড়া যায়, এ ভিতরের পুস্তক নিজে পড়া যায় না। গুরু তাহা পড়িয়া দেন, যদি গুরুর মত গুরু হ'ন।

"সদ্‌গুরু লাভ করিতে হইলে বিশুদ্ধ চেষ্টা চাই। চেষ্টা বিশুদ্ধ হইলে সদ্‌গুরু লাভ হইবেই হইবে। দেখ না ছেলে যখন মা মা করিয়া গড়াগড়ি দিয়া কান্দিতে থাকে মা কি তখন স্থির থাকিতে পারেন? তিনি যে আসিতে বাধ্য। তোমরাও ঐরূপে গুরু চাও। তিনি আসিবেনই আসিবেন। দেখ, আমরা কিন্তু ভগবানের চাকর নই। ভগবানই আমাদের চাকর। আমরা যাহা চাই তিনি তাহাই আমাদিগকে দিতে বাধ্য।

"তারপর গুরুবংশ-ধ্বংসের কথা। গুরু যে ভগবান্ তাহার আবার ধ্বংস আছে নাকি? আর যদি লৌকিক ভাবে দেখ তবে গুরুবংশের মত কত বংশেরই ধ্বংস হইতেছে। এই ধ্বংসের আবার বিশেষত্ব কি? তাহা ছাড়া, ঠিক ঠিক ভাবে কেহ কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিলে তাহাতে অপরাধ হয় এবং সেই দোষে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমি নানা ভাবেই বলিলাম তুমি ইহার যে কোন ভাব গ্রহণ করিতে পার।"

রাত্রি অনেক হইল দেখিয়া মা'কে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

২৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৪২ সন (ইং ১৫।১২।৩৫) সকাল বেলা মা'র নিকট যাইয়া দেখি তিনি তখনও শুইয়া আছেন। কিন্তু একটু পরেই

উঠিয়া মাঠে বেড়াইতে গেলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। অল্পক্ষণ বেড়াইয়া মা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া নামঘরে বসিলেন। আমরাও মায়ের কাছে বসিলাম।

অভ্যাস দ্বারাই স্বভাব গঠিত হয়

মতিবাবু আজ ভোরে আসিয়াছেন হ্যাট্ কোট পরিয়া। মা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাবাজী আজ সাহেব সাজিয়া আসিয়াছে। বাবাজী, হ্যাট্ কোট পর কেন ?"

মতিবাবু। ঠাণ্ডার জন্য।

মা। ঠাণ্ডার জন্য নয়। বরং বল যে উহা তোমার অভ্যাস। ঠাণ্ডা ত সকলের জন্যই আছে, কিন্তু সকলে ত এমন পোষাক পরে না।

মতিবাবু। আমার কাপড় নাই।

মা। কাপড়ের অভাব কি ? সমস্ত দোকান ভরাই কাপড়। তবে বলিতে পার যে, তোমার জন্য কাপড় নাই। দেখ, অভ্যাস হইতেই সব হয়। যাহা অভ্যাস করা যায় তাহাই স্বভাবের মধ্যে চলিয়া যায়। আমরা অনেক সময় বলি যে, আমরা ইহা করি, ইহা খাই, যেমন কাপড় পরি চা খাই। কিন্তু আসলে আমরা পরি না, খাই না। কাপড়ই আমাদিগকে পরে এবং চা-ই আমাদিগকে খায়। আমরা যদি পরিতাম বা খাইতাম তাহা হইলে ইচ্ছামত আবার উহা ছাড়িতেও পারিতাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জনা উহা পারে।

ব্রহ্মের স্বরূপ

কিছুক্ষণ পর মা নামঘর হইতে উঠিয়া মাঠে আসিয়া বসিলেন। স্ত্রী, পুরুষ অনেকে তখন মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ভদ্রলোকদের মধ্যে নগেনবাবুকে * দেখিলাম।

নগেনবাবু। মা, ব্রহ্মের স্বরূপ কি? এবং তাঁহার গুণই বা কি? শাস্ত্রে যে তাঁহাকে সৎ চিৎ আনন্দ বলে উহাই কি তাঁহার গুণ?

মা। তাঁহার স্বরূপ বা স্বভাব প্রকাশ করা যায় না, কারণ স্বভাব বলিতে গেলেই অভাব আসিয়া পড়ে। ভাষার মধ্যে তাঁহাকে আনিতে গেলেই তিনি খণ্ড হইয়া পড়েন। তবে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে সৎ চিৎ আনন্দ বলা হয়। তিনি আছেন তাই সৎ, তিনি জ্ঞানস্বরূপ তাই চিৎ। এই সৎ এর জ্ঞান হইলেই আনন্দ। সত্য বস্তু জানিলেই আনন্দ; তাই সৎ চিৎ আনন্দ। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি আনন্দ ও নিরানন্দের ঊর্দ্ধে।

নগেনবাবু। ব্রহ্মকে কেহ আনন্দ বলেন, কেহ জ্যোতিঃ বলেন, কেহ রূপ বলেন, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি? খাঁটি সত্য কোন্‌টা?

মা। আমি বলিলেই কি তুমি উহা ধরিয়া থাকিতে পারিবে? যদি বল যে পারিবে তবেই আমি উহা তোমাকে বলি।

উত্তর শুনিয়া নগেনবাবু একটু অপ্রস্তুত হইলেন।

---

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি East Bengal Times এর সম্পাদক ছিলেন। মা যখন শা'বাগে ছিলেন তখন হইতেই ইনি মা'র একজন ভক্ত।

মা। আমি ত বলিয়াছি সকলের নিকট আমার সকল কথা প্রকাশ হয় না। যাহার যেমন আধার সে সেইরূপ উত্তরই আমার নিকট হইতে পায়। আমি একটা যন্ত্র। আমাকে যেমন আঘাত করিবে সেইরূপ শব্দই পাইবে। আমিও ত বলি তোমরা আমার নিকট হইতে খাঁটি সত্য বাহির করিয়া নাও না। তোমরাও শোন আমিও শুনি।

নগেনবাবু। বেদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলে। তুমি ব্রহ্মকে ইহার উর্দ্ধে বসাইয়া নূতন কোন জ্ঞান প্রচার করিতেছ না কি? এই কি তোমার বাণী?

মা। নূতন কিছুই বলিতেছি না। শাস্ত্র যাহা বলিয়াছে ঠিকই বলিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছে কতটুকু? শাস্ত্র কিরূপ না ছাদে উঠিবার সিঁড়ির মত। শাস্ত্র কেবল এই সিঁড়ির ধাপের বর্ণনা দেয় মাত্র। ছাদে উঠিলে যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহার বর্ণনা শাস্ত্রে নাই; কারণ যে একবার ছাদে উঠিয়াছে সে ত নিজেই সমস্ত দেখিতেছে। যাহা দেখিতেছে তাহার বর্ণনার দরকার নাই। পথের বর্ণনারই দরকার। শাস্ত্রেও তাহাই আছে। তাই শাস্ত্র তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলে। প্রকৃত পক্ষে তিনি উহা বটেন, আবার তিনি উহারও উর্দ্ধে। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে, দেবদেবীর যে মূর্ত্তি দেখা যায় উহা সত্য কিনা? আমি বলি সবই সত্য আবার সবই মিথ্যা। এগুলিও সিঁড়ির ধাপ। এগুলি জীবের নানা অবস্থা, নানা ভাব। যখন

যে ভাবে থাকা যায়, সেই অবস্থায় উহা সত্য। পরে উহা হইতে ঊর্দ্ধে উঠিলে ঐ ভাবের লয় হয়। একে বারে যে লয় হয়, তাহা নহে। তবে কাহারও কাহারও পক্ষে উহার অস্তিত্ব থাকে না। যেমন নীচের সিঁড়ি হইতে উপরের সিঁড়িতে উঠিলে নীচের সিঁড়ি একেবারে লোপ পায় না। কিন্তু যে উপরের সিড়িতে দাঁড়াইয়াছে তাহার পক্ষে উহা না থাকারই মত। এসব ভাবও ঐরূপ। ভাবের রাজ্যে আমরা যখন থাকি, তখন সব দেবদেবী আমাদের কাছে সত্য। এই ভাবের রাজ্য ছাড়িয়া আমরা যখন সত্যের রাজ্যে যাই, তখন ভাব আমাদের মধ্যে লয় পায়, আমাদের কাছে উহা মিথ্যা হইয়া যায়। আমাদের কাছে মিথ্যা হয় বলিয়া যে উহা সকলের কাছে মিথ্যা হয় এমন নহে। উহা থাকিয়াই যায়। এই অর্থে দেবদেবী সত্য। তাই ব্রহ্ম খণ্ড ও অখণ্ডে যুগপৎ আছেন। খণ্ডও তিনি আবার অখণ্ডও তিনি। খণ্ডতেও তিনি পূর্ণ ভাবে আছেন আবার অখণ্ডতেও তিনি পূর্ণভাবে আছেন। যেমন আমার আঙ্গুল স্পর্শ করিলেও আমাকে স্পর্শ করা হয় অথচ আমি আঙ্গুল নহি; আমার কাপড় স্পর্শ করিলেও আমাকে স্পর্শ করা হইল অথচ আমি কাপড় নহি। আমার অংশ যেমন আমি, আবার সমগ্র আমিও আমি। এক হইয়াও তিনি বহু এবং বহু হইয়াও তিনি এক। ইহাই তাঁহার লীলা। একটি বালুকা কণাতেও তিনি যে ভাবে পূর্ণ, মানুষের মধ্যেও সেই ভাবে পূর্ণ আবার অখণ্ডতেও সেই ভাবে পূর্ণ। তবে ইতর জন্তু হইতে

মানুষের পার্থক্য এই যে, মানুষের মধ্যে এক বিশেষ শক্তি আছে যাহা দ্বারা সে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। মানুষ বলিতে আমি এই বুঝি যে, যাহার মনের হুঁশ্ হইয়াছে সেই মানুষ। যাহার মনের হুঁশ্ হয় নাই, যে বিষয়বাসনায় তন্ময় তাহাকে মানুষ বলা যায় না এবং সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীও নয়। ইতর জন্তুর মধ্যে যে এ শক্তি নাই তাহা বলা যায় না। তবে তাহাদের মধ্যে ঐ শক্তির প্রকাশ নাই, বা কদাচিৎ প্রকাশ। তোমরা জান যে, ভগবান্ মৎস্যরূপে, কূর্ম্মরূপে, বরাহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, মৎস্য, কূর্ম্ম ইত্যাদি জীবজন্তুর মধ্যেও তিনি পূর্ণ ভাবে আছেন এবং উহাদের মধ্যে নিজকে প্রকট করিয়া তিনি এই সত্যই প্রচার করিয়াছেন। অবতারবাদের ইহাই রহস্য। তাই বলি খণ্ডতেও তিনি, অখণ্ডতেও তিনি, তিনি যুগপৎ উভয়ই।

মাঠে বসিয়া আমরা যখন মা'র এই সব উপদেশ শুনিতেছিলাম তখন ঢাকা ইউনিভারসিটির রেজিষ্ট্রার খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন আহম্মদ সকাল বেলা ঐ মাঠে বেড়াইতে আসেন। তাঁহাকে দেখিয়া নগেনবাবু এবং অবনিবাবু তাঁহাকে ডাকিয়া মায়ের কাছে লইয়া আসিলেন। ভূপতিবাবু মাকে ইঁহার পরিচয় দিতে বলিলেন, "ইনি মুসলমান"। মা রেজিষ্ট্রার সাহেবের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা, আমিও মুসলমান।" মা'র ঐ কথা শুনিয়া ৺বিভূচরণ গুহ-ঠাকুরতা এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রদত্ত মহাশয় মা'র নমাজ পড়ার গল্প রেজিষ্ট্রার সাহেবকে বলিলেন। আমার মনে হইল যে, ঐ গল্পের সহিত মা'র উক্তির কোন সম্বন্ধ নাই।

"মুসলমান" শব্দের অর্থ হইল "ভগবানের অনুগত ভৃত্য"। বোধ হয় মা ঐ অর্থেই নিজকে মুসলমান বলিলেন।

রেজিষ্ট্রার সাহেব কিছুক্ষণ বসিয়া অন্য লোকের মারফতে মাকে একটি প্রশ্ন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইনি যদি শান্তি লাভ করিয়াই থাকেন তবে ইনি এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ান কেন? মাকে ঐ কথা বলা হইলে মা উত্তর করিলেন, "আমি যদি এক জায়গায় বসিয়া থাকি তবেও ত প্রশ্ন উঠিবে যে, আমি এক জায়গায় থাকি কেন?" একটু পর মা তাঁহার দেবদুর্লভ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি বড় অশান্ত মেয়ে তাই এক জায়গায় থাকিতে পারি না। আবার যদি অন্য দিক হইতে দেখ, তবে আমি বলিব যে, তোমাদের মধ্যে আসা-যাওয়ার বুদ্ধি আছে বলিয়াই তোমরা বলিতেছ যে, আমি এদিকে ওদিকে যাইতেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি এক জায়গায়ই আছি। অথবা আমি বলিব যে, আমি এদিকে ওদিকে যাই না, আমি আমার ঘরের মধ্যেই ঘুরিতেছি। তোমরা যখন তোমাদের বাড়ীতে থাক তখন কি তোমরা ঘরের এক কোনে বসিয়া থাক? তোমরাও ঘরের মধ্যে বেড়াও। আমিও সেইরূপ আমার ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছি। এই বিশ্বসংসার আমার ঘর। আমি ঘরেই আছি।"

শান্তিলাভের উপায়

রেজিষ্ট্রার। আপনি ত বেশ শান্তিতে আছেন। আমাদের কেবলই অশান্তি। কি উপায়ে শান্তি পাওয়া যায়? আপনি আমাদের মধ্যে শান্তি ছড়াইয়া দেন না?

মা। (হাসিয়া) তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ কি উপায়ে শান্তি পাওয়া যায়? আমি বলি যখন দেখিবে যে, তোমার ভিতর "কি—উপায়?" এই ভাবটি জাগিয়া উঠিয়াছে তখনই শান্তির পথ খুজিয়া পাইবে।

মা'র কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া আমরা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম।

মা। অশান্তির জিনিষ লইয়া থাকিলে শান্তি পাইবে কিরূপে? যে বস্তু লইয়া থাকা যায় তাহার আঁচ্ শরীরে আসিয়া লাগে। যেমন গরম বস্তুর কাছে গেলে গরম আঁচ লাগে, আবার ঠাণ্ডা বস্তুর কাছে গেলে ঠাণ্ডা আঁচ লাগে। বিষয় লইয়া থাকিলে, অশান্তির বস্তু লইয়া থাকিলে, অশান্তি ত আসিবেই। সৎ বস্তু বা শুদ্ধ বস্তু লইয়া থাকিলেই অখণ্ড শান্তি। উহা ভিন্ন অন্য বিষয়ে কেবল খণ্ড শান্তি অর্থাৎ শান্তি ও অশান্তি মিশান। তাই বলি সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ কর। কালীই বল, কি আল্লাই বল, কি খোদাই বল, উহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। কারণ সবই এক। আসল কাজ হইল সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করা। তোমাদিগকে একটা গল্প বলি—

এক রাজা ছিলেন। ধনদৌলতের তাঁহার কোন অভাব ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি শান্তি পাইতেন না। একদিন লোকমুখে শুনিতে পাইলেন যে, গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া জপতপ করিলে শান্তি পাওয়া যায়। তিনি তখন তাঁহার কুলগুরুর খোঁজ করিলেন। এতকাল কিন্তু কুলগুরুর কোন

খোঁজখবরই হয় নাই। কুলগুরুও নানা অভাবে অতি দীন-ভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন। রাজা তাঁহাকে দীক্ষা দান করিতে আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আসিয়া রাজাকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কিছুদিন জপতপ করিলেই রাজা শান্তি পাইবেন। শুভদিন দেখিয়া রাজা দীক্ষা নিলেন। গুরুও এই উপলক্ষ্যে নিজের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল করিয়া নিলেন। তাঁহার আর কোন অভাব রহিল না। এদিকে রাজা গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া যথাবিধি জপতপ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার অশান্ত ভাব রহিয়াই গেল। উহার উপশমের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তখন রাজা একদিন গুরুদেবকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনার কথামত আমি দীক্ষা লইয়াছি। জপতপও আপনার উপদেশ মত করিতেছি, কিন্তু শান্তির সন্ধান ত পাইলাম না। আমি আপনাকে আরও সাতদিন সময় দিতেছি। যদি ইতিমধ্যে আমি শান্তি না পাই এবং আপনিও যদি উহা লাভ করিবার কোন নূতন পথ দেখাইয়া দিতে না পারেন তবে সাতদিন পর আমি আপনাকে সপরিবারে বধ করিব।"

রাজার কথা শুনিয়া গুরুদেবের অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। তাঁহার আহারে অরুচি হইল, নিদ্রা লোপ পাইল, তিনি আসন্ন মৃত্যু-চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। কুলগুরুর সন্তানের মধ্যে মাত্র একটি ছেলে, কিন্তু ছেলেটিও একেবারেই গোবর-গণেশ।

বিদ্যা তাঁহার একেবারেই ছিল না। তিনি বনে জঙ্গলে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। কেবল আহারের সময় বাড়ী আসিতেন আর অন্য সময় তিনি যে কোথায় থাকিতেন তাহা কেহ বড় জানিত না। এদিকে একদিন একদিন করিয়া ছয় দিন গত হইল। সাতদিনের দিন কুলগুরুর বাড়ীতে রান্না খাওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ভয় ও দুশ্চিন্তায় গুরু ও গুরুপত্নী মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিলেন। দুপ্রহরের সময় গুরুপুত্র আহার করিতে বাড়ী আসিলেন এবং আহারের কোন আয়োজন নাই দেখিয়া রাগারাগি করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতামাতাও তাঁহাকে খুব গালাগালি দিতে লাগিলেন। এসব দেখিয়া শুনিয়া তিনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ অনুসন্ধান করিলেন; তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, আগামীকল্য রাজাকে নূতন শান্তির পথ দেখাইতে না পারিলে সকলেরই প্রাণ যাইবে। ইহা শুনিয়া ছেলে বলিলেন, "এর জন্য এত চিন্তা কি?" তোমরা আহারের জোগাড় কর; কাল আমিই রাজাকে শান্তির পথ বলিয়া দিব।" ছেলের কথায় গুরুদেব আশ্বস্ত হইলেন। তখন সকলেই স্নানাহার শেষ করিলেন।

পরদিন পিতাপুত্র একত্র হইয়া রাজবাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, "গুরুদেব, আপনার কথামত গত সাতদিন আমি জপাদি করিয়াছি। কিন্তু শান্তি পাই নাই। কেন আমি শান্তি পাইলাম না তাহা যদি আজ

বলিতে না পারেন অথবা শান্তি পাওয়ার নূতন কোন পথ দেখাইয়া দিতে না পারেন তবে আমার কথা মত আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব। গুরুদেব পূর্ব্বশিক্ষানুসারে রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ আপনি কেন শান্তি পাইলেন না তাহার উত্তর আমার ছেলে আপনাকে দিবে।" রাজা গুরুপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ইহার উত্তর দিতে পারিবে ?" গুরুপুত্র বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ, আমিই উত্তর দিব। তবে আপনাকে আমার কথামত কাজ করিতে হইবে। আমার কথামত কাজ করিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, এতদিন আপনি কেন শান্তি পান নাই এবং শান্তির পথ কোন দিকে।" রাজা সম্মত হইলেন।

গুরুপুত্রের নির্দ্দেশমত রাজা এবং কুলগুরু দুইটি বড় দড়ি লইয়া এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর যাইয়া দেখা গেল যে, তিনটি বড় গাছ এক জায়গায় পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। গুরুপুত্র তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং একটি দড়ি লইয়া রাজাকে এক বৃক্ষের সঙ্গে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিলেন এবং অপর দড়িটি লইয়া তাঁহার পিতাকে অন্য একটি বৃক্ষের সঙ্গে ঐরূপ বাঁধিলেন। মাঝে যে গাছটি রহিল তিনি নিজে উহার উপর চড়িয়া মনের আনন্দে গান করিয়া লাফালাফি করিতে লাগিলেন। এদিকে বন্ধনের যন্ত্রনায় রাজা অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি গুরুপুত্রকে ডাকিয়া বন্ধন মোচন করিতে বলিলেন। কিন্তু গুরুপুত্রের সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি

আপন মনে নাচিতেছেন, গাহিতেছেন, এক ডাল হইতে অন্য ডালে অবাধগতিতে চলাফেরা করিতেছেন। রাজা তখন তাঁহার গুরুদেবকে বন্ধন মোচন করিতে বলিলেন। গুরুদেব বলিলেন, "আমি যে নিজেই আবদ্ধ আপনাকে মুক্ত করিব কিরূপে?" যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে করিতে রাজার হঠাৎ দিব্যজ্ঞান হইল। তিনি ভাবিলেন, "তাই ত, সংসারের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া আমি শান্তিলাভের আশা করি কি প্রকারে? আর যিনি নিজেই বদ্ধ তিনিই বা আমাকে মুক্তির পথ বলিয়া দিবেন কি প্রকারে?" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি গুরুপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন আমার বন্ধন মোচন কর। আমি শান্তির পথ পাইয়াছি।" গুরুপুত্র তখনই রাজাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। রাজা আর সংসারে ফিরিলেন না। সন্ন্যাসী হইয়া একদিকে চলিয়া গেলেন।

বিষয়ে বদ্ধ থাকিলে শান্তি পাইবে কিরূপে? তবে আমি বলিতেছি না যে, শান্তি পাইতে হইলেই জঙ্গলে যাইতে হইবে। সংসারে থাকিয়াও শান্তিলাভ করা যায়। সংসার তাহাদের কাছেই তাপময় যাহারা সংকে সার করিয়াছে। তাই বলি বাবা, তোমাদের এই মেয়েটাকে তোমরা বুকে তুলিয়া লও। তোমরা ইহাকে মা বলিয়া কোণঠেসা করিয়া রাখিয়াছ। মা ত বুড়ী। বুড়ীকে ত তোমরা বুকে তুলিয়া লও না। আমাকে তোমরা মেয়ে করিয়া বুকে তুলিয়া লও। এই আমার প্রার্থনা।

ঐ দিন দুপ্রহরে কীর্ত্তন হইবার কথা ছিল। বৈকালবেলা একটু বিলম্বে আশ্রমে গেলাম। তখনও কীর্ত্তন চলিতেছিল। সন্ধ্যার পর মা আশ্রমের বাহিরে মাঠে আসিয়া বসিলেন। তখন কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

দীক্ষার সময়, গুরুলাভ, কুলগুরু ইত্যাদি

অবনিবাবু*। মা, দীক্ষার আবার সময়, অর্থাৎ বার, তিথি আছে নাকি ?

মা। ইহা সংস্কারের উপর নির্ভর করে। সদ্গুরু যখন দীক্ষা দেন তখন বার, তিথি, শুচি, অশুচি এ সব বিচার করেন না। আবার অনেক সময় এ সব বিচারও করিতে হয়।

ক্ষিতীশবাবু†। "গুরু আপনি আসেন" এ কথার অর্থ কি ?

মা। সবই ত আপনি হইয়া যায়। আমরা অজ্ঞান বলিয়া তাহা বুঝিতে পারি না। লৌকিক হিসাবে দেখিলে দেখা যায় যে, লোকের গুরু পাইবার ইচ্ছা হয় এবং গুরু খুঁজিয়া বাহির করে এবং তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ সব আপনা আপনি হইতেছে। সময় হইলে সবই হইয়া যায়। তখন ইচ্ছাও জাগে এবং গুরুও পাওয়া যায়। দেখ না, বীজ মাটিতে বুনিলে গাছ আপনি হয়। উহার জন্য আর চেষ্টা করিতে হয় না। সেইরূপ বিনা চেষ্টাতেই জগতের সমস্ত

* শ্রীযুক্ত অবনিমোহন বসু। ইনি ঢাকার একজন উকিল এবং মা'র একজন ভক্ত।

† শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিষ্ট্রারের হেড্‌ক্লার্ক।

জিনিষ আপনা-আপনি হইয়া যাইতেছে। যদি কেহ মনে করে যে, আমার গুরু আপনি আমার কাছে আসিয়া আমাকে দীক্ষা দিবেন এবং এই ভাবিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, তবে গুরু নিশ্চয়ই তাহার কাছে আসিবেন। কিন্তু এরূপ ভাব সাধারণের হয় না। সাধারণতঃ লোকেরা গুরু খুঁজিয়া বাহির করে এবং তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লয়।

ক্ষিতীশবাবু। কুলগুরু হইতে কি দীক্ষা লওয়া চলে?

মা। যদি ভক্তি-বিশ্বাস থাকে তবে লওয়া চলিবে না কেন? কুলগুরুর নিকট হইতেই সংসারিদের মন্ত্র লওয়া ভাল। কুলগুরু কুলের মঙ্গল চিন্তা করেন। কাজেই তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া কাজ আরম্ভ করা ভাল।

ক্ষিতীশবাবু। আচ্ছা, নাম করা কি গুরুদত্ত নাম করা?

মা। হাঁ, নাম করা অর্থই ইষ্টনাম জপ করা।

ক্ষিতীশবাবু। গুরুদত্ত নাম মাঝে মাঝে করিলাম, আবার কীর্ত্তনাদিও করিলাম এতে কি কোন দোষ আছে?

মা। দোষ কি? এ সব ত ভালই। সব নামই তাঁহার নাম। সবগুলিই শুদ্ধভাবের সহায়ক।

আমি। নামের সঙ্গে কি সংস্কারের কোন সম্বন্ধ নাই?

মা। তোমার প্রশ্ন বুঝিলাম না।

আমি। গুরু যে নাম দেন তাহা ত আর খামখেয়ালী বশে দেন না। তাহা শিষ্যের সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দেন।

মা। নিশ্চয়।

আমি। তবে সেই নাম ত্যাগ করিয়া শিষ্য অন্য নাম জপ করিলে উহা তাহার সহায় হয় কিরূপে?

মা। ভাব ত একটাই। সকল নামই ত ঐ এক ভাব প্রকাশ করে। কাজেই নাম, পূজা, ভজন যাহা কিছু কর না কেন তাহাতে বিশুদ্ধ ভাব পুষ্ট হইবেই।

আমি। মা, তুমি সমস্ত কথার উত্তর উচ্চস্তর হইতে দিও না! প্রথমে নিম্ন স্তরে হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চস্তরে উঠিতে থাক; তবেই আমরা তোমার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। আমার প্রশ্নটি হইল এই যে, আমরা এক নাম লইয়া জপ আরম্ভ করিলাম। আমরা শুধু জপ করি না, সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানও করি। ঠিক ঠিক ধ্যান অবশ্য আমাদের হয় না। তবুও আমরা কোন মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া লই, অথবা কোন ছবি চিন্তা করি। উদ্দেশ্য মন স্থির করা। কিন্তু এক নাম ছাড়িয়া যখন অন্য নাম গ্রহণ করিব তখন নামের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন মূর্ত্তিরও ধ্যান আসিয়া পড়িবে। ক্রমাগত যদি আমরা ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ধ্যান করিতে থাকি তবে চিত্ত স্থির না হইয়া বরং চঞ্চলই হইবে। এইরূপ চঞ্চল চিত্ত ধর্ম্মের সহায় হয় কিরূপে?

মা। তোমাকে ইতিপূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, লোকে ধ্যান করে না; ধ্যান আপনা হইতেই হয়। তাহা ছাড়া যদি এক নাম কাহারও মনের সঙ্গে গাঁথিয়া যায় তবে সে যে নামই শুনুক না কেন তাহার মনে হয় যে, সে এক নামই শুনিতেছে। সকল নামের মধ্যে সে এক নামেরই ধ্বনি পায়। তুমি আমাকে নীচে

নামিয়া আসিয়া উত্তর দিতে বলিয়াছ; আমি তাহাও দিতেছি। প্রথম নাম অভ্যাস করিতে এক নাম লইয়াই আরম্ভ করা ভাল এবং উহাকেই মনের উপর বসাইয়া দিতে চেষ্টা করা ভাল। তাই গুরু যে নাম দিয়াছেন, বা যে নাম ভাললাগে তাহা জপ করিতে হয়। পরে তাহা মনের মধ্যে বসিয়া গেলে ক্রমে উচ্চ অবস্থা লাভ হয়। যদি আরও নীচে আসিয়া বলি তবে বলিব যে, যাহাদের ধর্ম্মভাব ভাল করিয়া ফোটে নাই তাহারা যে নাম ইচ্ছা সেই নামই লইতে পারে, যে পূজা ইচ্ছা সেই পূজাই করিতে পারে। কোন প্রকারে ধর্ম্মভাবটি জাগাইবার জন্য পূজা, জপ, ধ্যান, কীর্ত্তন, দান যাহা কিছু সে করে তাহাতেই সে উপকার পাইবে। এখন বুঝিলে?

আমি। হাঁ মা, বুঝিলাম।

সিদ্ধিলাভ, দেবদর্শন

একটি উকিল। কেমন করিয়া সিদ্ধিলাভ করা যায় এবং তখন জীবাত্মা কি দর্শন করে?

মা। একেবারে শুদ্ধ হইলেই সিদ্ধ হয় এবং তখন জীবাত্মা সব সিদ্ধ দর্শন করে। (সকলের হাস্য)। সিদ্ধি বলিতে তুমি কি বুঝ? সিদ্ধি ত অনেক প্রকারের আছে, যেমন অষ্টসিদ্ধি, কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা। তুমি কোন্ সিদ্ধি বুঝাইতেছ? আবার তুমি বলিতেছ যে সিদ্ধিলাভ করিলে কি দেখে? আমি

বলি সিদ্ধিলাভ করিলে সিদ্ধই দেখে, যেমন আলু সিদ্ধ, পটল সিদ্ধ। (সকলের হাস্য) ইহা হাসিবার কথা নহে। ইহা খাঁটি সত্য। সে দেখে যে, সব 'আমি' অথবা সব 'তুমি'। আবার 'আমি', 'তুমি', জগৎ সব একের মধ্যে লয় পায়। ইহাকেই ভগবান্ লাভ বা ব্রহ্মদর্শন বলে।

প্রমথবাবু। তবে যে শুনি ভগবান্ আসিয়া দেখা দেন। লোকে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করে, এগুলি কি মিথ্যা ?

মা। আমি বলি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) আবার বলি যে, উহা খাঁটি সত্য। (আমার দিকে চাহিয়া) এগুলি ত আজ সকাল বেলার কথা। যতক্ষণ আমরা অভাবের স্বভাবে আছি ততক্ষণই এ সব দর্শন-স্পর্শন আছে। স্বভাবে স্থিতি হইলে সবই একাকার হইয়া যায়।

প্রমথবাবু। অভাবের স্বভাব বুঝিলাম না, মা। স্পষ্ট করিয়া বল।

মা। আমরা এখন অভাবে আছি। উহাই এখন আমাদের স্বভাব হইয়াছে। যেমন আমাদের ক্ষুধা লাগে, আমরা অভাব বোধ করি, পরে খাইলে অভাব দূর হয়। তখন আবার ঘুমের অভাব বোধ করি, ঘুম হইতে উঠিয়া আবার বেড়াইবার বা গল্প করিবার অভাব বোধ করি। এইরূপ একটা না একটা অভাব আমাদের লাগিয়াই আছে। আমরা এই অভাবেই স্থিতি লাভ করিয়াছি। ইহাকেই অভাবের স্বভাব বলে। ইহা হইতে স্বভাবে যাইতে হয়। স্বভাবের যাইবার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে আছে।

এইজন্য বলে যে, মানুষের মধ্যে যেমন অজ্ঞানের পরদা আছে, তেমনই জ্ঞানের দরজাও আছে। জ্ঞানের দরজা দিয়াই লোক স্বভাবে ফিরিয়া যায়, স্থিতি লাভ করে।

ইহার পর কীর্ত্তনীয়ারা একে একে বিদায় হইতে লাগিল। যাহার দল সে মায়ের নিকট আসিয়া বলিল, "মা, গত বৎসর তোমার এখানে কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ছিলে না বলিয়া কীর্ত্তন করি নাই। গত বৎসর আমার ৩০০৲ লোকসান হইয়াছে। ভয় হয় এবারও বা ঐরূপ হয়। তুমি বলিয়া দাও এবার আমি কোন দিকে কীর্ত্তন করিতে যাইব?

মা। এ সব কথা আমি বলি না, বলিতে পারি না। তোমরা তাঁহার নাম লইয়া বাহির হও। যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাও; চিন্তা কি?

পূর্ব্বজন্মের সংস্কার

ইহার পর কীর্ত্তনীয়াকে বলিলেন, "বাবা, বাজনা ছাড়া আমাকে শুধু একটি গান শুনাও।" তখন কীর্ত্তনীয়া তাহার দলের একটি ছোট ছেলেকে গান করিতে বলিল। ছেলেটি মা'র কাছে আসিয়া বসিল। মা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

ছেলে। হরিদাস।

মা। এটি কি ইহার তোমাদের দেওয়া নাম, না ছোট বেলা হইতেই ইহাকে এই নামে ডাকে?

কীর্ত্তনীয়া। এটি ইহার দেওয়া নাম।

মা। (ছেলেটিকে) তোমার বাবার নাম কি?

ছেলে। কেরামত আলী।

মা শুনিয়া খুব সুখী হইলেন এবং ছেলেটির গাল ধরিয়া আদর করিলেন।

মা। দেখ, কেমন যোগাযোগ! এ মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও পূর্ব্বসংস্কারবশে কেমন এখানে (অর্থাৎ হিন্দুদের সংস্পর্শে) আসিয়া পড়িয়াছে এবং কৃষ্ণনাম গান গাহিয়া সময় কাটাইতেছে। তাই বলি যে, ধর্ম্মে জাতিবর্ণ ভেদ নাই।

ছেলেটি একটি গান করিল—

"সংসার-মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণনাম ভজ মন"

খুব মধুর স্বরে গান করিল। উপস্থিত সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

মা। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার গানের ভাঁজে ধরা পড়ে। (ছেলেটিকে) তোমার কে আছে? তুমি কাহার কাছে থাক?

কীর্ত্তনীয়া। ইহার কেহ নাই। ও আমাদের দলেই থাকে এবং আমাদের সঙ্গে গান করিয়া বেড়ায়।

মা। (ছেলেটিকে) যখন তোমার কেহ নাই তুমি আমার সঙ্গে থাক না? আমি তোমার গান শুনিব। কেমন?

এই কথাগুলি যে কত মধুর স্বরে বলা হইল তাহা প্রকাশ করা যায় না। মা যেন বিশ্বের সমস্ত স্নেহমমতা ঢালিয়া কথাগুলি বলিলেন। ছেলেটি চুপ করিয়া রহিল।

মা। কেমন, তুমি আমার কাছে থাকিবে? তোমার ত ওখানেও কোন আপনজন নাই, আমার কাছেও নাই। তবে

আমার কাছে থাকিতে আপত্তি কি ? আমার কাছে তুমি থাকিবে, আমাকে গান শুনাইবে, কেমন ?

ছেলে। আমার উপর আপনি কৃপা রাখিবেন। (সকলের হাস্য)।

মা। আমার সহিত উহার যাইবার ইচ্ছা নাই, তাই এই ভাবে উত্তর দিল।

ছেলেটি বিদায় হইল। আমি ভাবিলাম ছেলেটির সময় হয় নাই জানিয়াও মা এরূপ করিলেন কেন ? এই ছেলেটিকে কাছে আনিবার জন্যই ত মা গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ যে মুসলমানের ছেলে তাহা কেহ না বলিলেও মা পূর্ব্বেই ইহা জানিতেন। সেইজন্য ‘হরিদাস’ নাম শুনিবা মাত্র মা বলিলেন, “ইহা কি এর দেওয়া নাম ?” এমন কি মা যে ইহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার জানেন সে বিষয়েও একটু ইঙ্গিত করিলেন। তথাপি উহাকে ডাকিয়া মা এ সব প্রশ্ন করিলেন কেন ? ইহা কি কৃপা করিবার ছল মাত্র ? ছেলেটিকে মা একবার স্পর্শও করিলেন যাহা তিনি সচরাচর করেন না। কি উদ্দেশ্যে মা এ সব করিলেন তাহা কেবল মা-ই জানেন।

একটু পর বাউলবাবু গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, কেমন আছ ?”

বাউলবাবু। তুমি কেমন আছ আগে তাহাই বল, তবেই আমরা কেমন আছি তাহা বলা হইবে। (মা’র কাছে বসিয়া) মা, আমরা বদ্ধজীব; ছেলে, মেয়ে, সংসার লইয়া জড়িত হইয়া আছি। তোমরা এখন পাহাড়ে থাক। শুনিয়াছি পাহাড়ে থাকিলে সমতল ভূমির লোক দেখা যায় না।

মা। পাহাড়ের উপরে থাকিলে নীচের লোকদিগকে যে দেখা যায় না এমন না, তবে সবই সমান দেখা যায়।

বাউলবাবু। এতদিন পরে ত বাপের বাড়ী হইতে (অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বত হইতে) আসিলে, আমাদের জন্য কি আনিয়াছ?

মা। আমি আমাকেই তোমাদের জন্য আনিয়াছি। আমিই যে তোমরা।

এই ভাবে কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল। কথায় মাকে জব্দ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিয়াছে দেখিয়া মাকে আশ্রমের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। আমিও বিদায় লইয়া আসিলাম।

বারিক মাই, যাদুর বড়ি

পরদিন (৩০শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৪২ সন, ইং ১৬।১২।৩৫) মায়ের ভোজনের দিন। সকাল বেলা কিছু ফল ও মিষ্টি লইয়া আশ্রমে গেলাম। বহু লোক মাকে ঘিরিয়া আছেন। মা কিছুক্ষণ মাঠে বেড়াইয়া আসিলেন। পরে তাঁহার কুটীরের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। নানা কথার পর বারিক মাইর গল্প বলিলেন।

বারিক মাই একটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক। তাঁহার প্রকৃত নামটি মনে নাই। মা তাঁহাকে বারিক মাই বলিয়া ডাকিতেন। স্ত্রীলোকটি বিধবা। সে এত মোটা ছিল যে, তাঁহাকে দেখিলে একটি মাংসপিণ্ড বই আর কিছু মনে হইত না। পাছে লোকে তাহাকে মোটা বলে সেইজন্য মা তাহাকে "বারিক" বলিতেন। বারিক শব্দের অর্থ সরু।

বারিক মাই যদিও লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তিনি বেশ বক্তৃতা দিতে পারিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেসে যোগ

দিয়াছিলেন এবং নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন। গান, কবিতা ইত্যাদিও তিনি রচনা করিতে পারিতেন। একবার মাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি এক গান রচনা করিয়াছিলেন। উহার এক স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার শরীরের চর্ম্ম দিয়া তোমার জুতা তৈয়ার করিব।" এই সব গান তিনি এমনি উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেন এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ এমনি জোর গলায় পাঠ করিতেন যে, লোকে উহা শুনিয়া দূরে পলাইতে পারিলে বাঁচিত। ইহার জন্য লোকে তাঁহাকে খুব ঠাট্টাও করিত, কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। এমনি তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প!

তিনি যে কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন ইহা তাঁহার আত্মীয়েরা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা উপদেশ দিয়া যখন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন একদিন তাঁহাকে দোতলার একটি কোঠাতে রাখিয়া সিঁড়িতে তালা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা না করিবেন যে, তিনি কংগ্রেসে যোগ দিবেন না ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িবেন না। তিনিও আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলেন। গৃহের মূল্যবান জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন না। যখন তিনি জানিলেন যে, কিছুতেই উহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না তখন দোতলা হইতে লাফ দিয়া মাটিতে পড়িয়া কংগ্রেস-আফিসের দিকে দৌড়াইয়া গেলেন। এই বিশাল দেহ লইয়া দোতলা হইতে লাফ দিতে একটুকুও ভয় পাইলেন না। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলসূত্র। একবার কংগ্রেসের কাজে তাঁহার জেল হইল; জেলে যাইয়া তিনি রাত্রিতে রাসভ কণ্ঠে এমন গান আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতে লোকের নিদ্রা ত দূরের কথা তাহাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষ শত

চেষ্টা করিয়াও তাঁহার গান থামাইতে পারিলেন না। তাঁহারা ভয় দেখাইলে তিনি বলিতেন, "তোমরা আমার হাত পা বাঁধিয়াছ কিন্তু আমার জিহ্বা বন্ধ করিবার তোমাদের শক্তি নাই। আমি চিৎকার করিবই। তোমাদের যাহা সাধ্য থাকে কর।" শেষে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

জেল হইতে বাহির হইয়া বারিক মাই "সৎসঙ্গ" গঠন করিলেন। সেখানে সদালোচনা, সদগ্রন্থপাঠ হইত এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে ভজনগান হইত। এইভাবে সদালোচনায় তিনি দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "আমি যখন হৃষীকেশে ছিলাম তখন সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত। তাহাকে আমার কাছে আসিতে দেখিয়া তাহার সৎসঙ্গ-দলের অন্যান্য পাঞ্জাবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত যে, সে এক বাঙ্গালী মেয়ের কাছে যায় কেন? সে কি জানে না যে, বাঙ্গালী মেয়েরা যাদু জানে? তাহারা মন্ত্রবলে মানুষকে ভেড়া করিয়া রাখিতে পারে। এই সব কথা অনবরত শুনিয়া এবং আমার কাছে কিছুদিন যাতায়াত করিয়া সে যখন দেখিল যে এখানে লাভ করিবার মত কিছু নাই তখন আমার কাছে আসা-যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

"একবার সারদা ছুটি লইয়া কয়েক দিনের জন্য হৃষীকেশে আসিল। তাহার বড় ইচ্ছা হইল যে, বারিক মাইর পাঠ ও গান শুনে। সে উহার খোঁজ করিতে লাগিল। একদিন আমরা পূর্ণানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি পথে হঠাৎ বারিক মাইর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সারদা তাহাকে পূর্ণানন্দ স্বামীর

আশ্রমে লইয়া গেল। ইহার পর হইতেই সে আবার আমার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল এবং কিছুদিন যাতায়াত করিতে করিতে আমার কাছে আসা তাহার একটা নেশার মধ্যে দাঁড়াইল। তখনও তাহার সঙ্গীরা তাহাকে আমার কাছে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করে নাই। সে যে কেবল আমার কাছে আসিত এমত নহে। সে আমার কাছে খাইত, শুইত এবং সর্ব্বদা আমার কাছেই বসিয়া থাকিত। এই ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, সে আমার কাছ ছাড়িয়া কোথায়ও যাইত না। তাহার স্বভাবের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল। এমন কি সে নিজেও বিস্মিত হইয়াছিল।

"এদিকে আমি যেমন একদিন পর একদিন আহার করি, সেও সেইরূপ আরম্ভ করিল। আমার নিষেধ সে মানিল না। লোকের নিকট আমার যাদুবিদ্যার কথা শুনিয়া এবং নিজের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল যে, আমি সত্যসত্যই বুঝি যাদুবিদ্যা জানি। সে আরও শুনিয়াছিল যে, রাত্রিতে যখন আমি শুইয়া থাকি তখন মাটি হইতে শূন্যে উঠিয়া যাই। সে ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য সারারাত জাগিয়া কাটাইতে লাগিল। কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও সে অলৌকিক কিছু দেখিতে পাইল না; বরং রাত্রিতে মাঝে মাঝে আমার কথা শুনিয়া সে বুঝিল যে, রাত্রিতে আমি নিদ্রা যাই না। তখন সে

মনে করিল যে, সে সজাগ থাকে বলিয়াই বোধ হয় আমি শূন্যে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিয়াছি। কাজেই রাত্রিতে আর বসিয়া না থাকিয়া সে নিদ্রার ভাণ করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিছুদিন এইভাবে কাটিলে অনাহারে এবং অনিদ্রায় সে ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং একদিন রাত্রিতে তাহার মরণাপন্ন অবস্থা হইল। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গেল, মুখে কেবল গোঁ গোঁ শব্দ। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমি জ্যোতিষকে বলিলাম, "এর অবস্থা বড় খারাপ, তুই আগুন আনিয়া একে একটু সেক দে। আর উহার বুকেপিঠে হাত বুলাইয়া দে।" জ্যোতিষ উহার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "মা, ইহার জ্বর হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "জ্বর নিশ্চয়ই হয় নাই। তুই কেবল বুকেপিঠে হাত বুলাইয়া দে।" জ্যোতিষ আমার কথামত হাত বুলাইতে লাগিল, কিন্তু দেখিলাম যে, ভয়ে সে এমনি আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদ্বারা সেবা হইবার কোন আশাই নাই। কাঁপিতে কাঁপিতে সে অবশ হইয়া বসিয়া রহিল। তখন অগত্যা আমি যাইয়া উহার বুকেপিঠে হাত বুলাইতে লাগিলাম। জ্যোতিষ আমাকে বলিল, "দেখ ত উহার শ্বাস বয় কি না?" আমি দেখিলাম শ্বাস অতি ধীরে ধীরে বহিতেছে এবং শেষে যেন উহা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। যাহা হউক কিছুক্ষণ হাত বুলাইতে বুলাইতে উহার অবস্থা একটু ভাল হইল। তখন সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। ইহা দেখিয়া জ্যোতিষ উহাকে দুইটি কবিরাজি ঔষধের

বড়ি খাওয়াইয়া দিল। ঐ ঔষধ জ্যোতিষকে গোপালজী দিয়াছিল। দেরাদুনে জ্যোতিষ যখন অসুখে খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল তখন তাহাকে সবল করিবার জন্য ঐ ঔষধ দেওয়া হয়। উহার কতকগুলি বড়ি বোধ হয় জ্যোতিষের নিকট ছিল। এই ঔষধ খাইয়া সে কিছু সুস্থ হইল। এই ভাবে রাত্রি কাটিল। পরদিন তাহাকে গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা বলা হইল এবং আরও বলা হইল যে, সে যদি রাত্রিতে না ঘুমায় তবে সে আমার কাছে থাকিতে পারিবে না। সে ঘুমাইতে স্বীকার করিল।

"তাহার সঙ্গিনীরা এই ঘটনা শুনিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, "তুই কি এখনও বুঝিতে পারিলি না যে, বাঙ্গালী মায়াবিনী তোকে যাদুর বড়ি খাওয়াইয়া দিয়াছে। তোর শরীর যে এত খারাপ উহাও ঐ যাদুর জন্য।" এই সব কথা শুনিয়া এবং শরীরের অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রত্যয় হইল যে, আমি বুঝি সত্যসত্যই তাহাকে কিছু করিয়াছি। সে আমার কাছে আসা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিল। কিছুদিন পর তাহার বিছানাপত্র লইতে আমাদের ধর্ম্মশালায় আসিল। তখন আমাদের হরিদ্বার যাওয়া স্থির হইয়াছে। আমাদের জন্য বাস্‌ও (bus) আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই আমি বলিলাম, "কি, মা, তোমার যাদুর কত দূর হইল ?" ইহা শুনিয়া সে ভাবিল আমি বুঝি সবই জানি এবং সবই দেখিতে পাই। সে আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,

"মা, আমি তোমার সহিত হরিদ্বারে যাইব।" আমি বলিলাম, "তুমি এখান হইতে চলিয়া না গেলে ত আমার সঙ্গে যাইতে পারিতে। কিন্তু এখন ত তাহা হইবার উপায় নাই। আমাদের গাড়ী প্রস্তুত উহাতে আর একটি লোকেরও জায়গা হইবে না।"

"তাহাকে রাখিয়া আমরা হরিদ্বারে চলিয়া আসিলাম। পরে অবশ্য সে আমাদের কাছে আসিয়াছিল; কিন্তু আমি আর তাহাকে আমাদের কাছে না রাখিয়া তাহাকে তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম। পরে সে নিজেই বুঝিয়াছিল যে, তাহার শরীর খারাপের কারণ যাতুবিত্থার জন্য নয়; আহারনিদ্রা-ত্যাগ হইতেই উহা হইয়াছিল। এখন তোমরা শুনিলে ত কেমন করিয়া বাঙ্গালী মায়াবিনী যাতুর বড়ি খাওয়ায়? তবে জানিও যে, শুদ্ধভাবে একলক্ষ্য হওয়া একটা যাতুর মতই। যদি ঐ ভাব একবার আসিয়া পড়ে তবে উহা আর ছাড়ান যায় না।"

আজ অনেকেই বাবা ভোলানাথের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইতে ঐ দীক্ষাদান আরম্ভ হয়। আমি যখন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আশ্রমে পৌছি তখনও এই দীক্ষার কাজ চলিতেছিল। শিব-মন্দিরের মধ্যে মা ও বাবা ভোলানাথ বসিয়াছেন, দ্বারে স্বামী শঙ্করানন্দজী। দীক্ষাপ্রার্থীরা একজন একজন করিয়া ভিতরে যাইতেছেন। আমরা মাঠেই বসিয়া রহিলাম। রাত্রি প্রায় ৭ টার সময় মা ও বাবা ভোলানাথ দিদিমার বাড়ীতে আহার করিতে গেলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে আমরা নামঘরে যাইয়া দাঁড়াইলাম। এই সময় ভূপতিবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, ঢাকা ইউনিভারসিটির ভূতপূর্ব্ব ইলেকট্রিসীয়ান

৺সরোজবান্ধব ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী মা'র সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কথা মাকে বলায় মা নাকি বলিয়াছিলেন যে, সে যেন আসিয়া মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহা না হইলে মা'র মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইবে না। আমি ভূপতিবাবুকে বলিলাম, "আপনি কেন ইহার কারণ মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না?" তিনি বলিলেন যে, তখন তাঁহার ইহা খেয়াল হয় নাই। পরে জিজ্ঞাসা করিবেন।

অনাহত ধ্বনি, যোগবিভূতি

কিছুক্ষণ পর মা নামঘরে আসিলেন। মেয়েরা একে একে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে লাগিলেন! মেয়েদের সংখ্যা কমিয়া আসিলে ভূপতিবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি যে তখন বলিয়াছিলে যে, কেহ তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে তোমার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হয় না ইহার কারণ কি?"

মা। দেখ, একটা ধ্বনি অনবরতই আমার ভিতর চলিতেছে। ঐ ধ্বনিতে একটা আঘাত পড়িয়া আর একটা ধ্বনি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছু শুনিতে পাই না এবং আমার মুখ হইতেও কোন শব্দ বাহির হয় না। যখন কোন প্রশ্ন করা হয় তখন ঐ ধ্বনির উপর একটা আঘাত পড়ে এবং সেই অনুযায়ী আমার ভিতর হইতেও একটা উত্তর বাহির হইয়া আসে।

অনেক সময় এরূপ হয় যে, কেহ কথা বলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমি কিছুই শুনিতে পাই না। মনে হয় উহারা যেন বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে। আবার কেহ যদি কখনও মনে মনে প্রশ্ন

করে তবে আমি তাহাকে ঐ ভাবেই উত্তর দিয়া থাকি। এ প্রশ্ন বা উত্তর অন্য কেহ শুনিতে পায় না। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, আমি কথা বলিয়া যাইতেছি ঐ কথার মধ্যেই উপস্থিত লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ সমস্যার মীমাংসা পাইয়া যায়। মুখে বা মনে প্রশ্ন না করিয়াও তাহাদের সংশয়ের সমাধান পায়।

(আমাকে লক্ষ্য করিয়া) বাবাজী আমাকে নীচে নামিয়া উত্তর দিতে বলিয়াছে, তাই আমি খুব নীচে নামিয়া বলিতেছি যে, সাধন করিতে করিতে এমন অবস্থা হয় যে, কেহ যদি সাধকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তাহার মনের ভাবগুলি আপনা আপনি সাধকের মনে ভাসিয়া উঠে। সে নিজের ভাবগুলি যে ভাবে জানিতে পারে, পরের ভাবগুলিও ঠিক সেই ভাবে জানিতে পারে। কে কি ভাব লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারে, কণ্ঠস্বর শুনিয়াও জানিতে পারে। তোমরা কি অনেক সময় দেখ না যে, শিশু কথা বলিতে না পারিলেও বয়স্ক লোকেরা তাহার অঙ্গভঙ্গী দেখিয়াই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারে; সেইরূপ যাঁহারা সাধন করিয়া একটু উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের মত শিশুর হাব, ভাব, দৃষ্টি হইতেই মনের কথা বুঝিতে পারেন।

এগুলি সাধনের অবস্থা। প্রত্যেক সাধকের এই সব শক্তিলাভ হয়। যখন সাধকের এই সব শক্তিলাভ হয় তখন তাহার খুব আনন্দ হয়। এ আনন্দও ভগবানের শক্তিবিকাশের

জন্য। কারণ বিভূতিগুলি ভগবানের শক্তি বই আর কি? সাধক সাধনা বলে যে পরিমাণে বিশুদ্ধ ভাব লাভ করে তাহার হৃদয়েও সেই পরিমাণে শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু এই সব শক্তিলাভ করিলে উহা প্রকাশ করিতে নাই। যে টুকু আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়ে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সাধক অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া ঐ শক্তি প্রকাশ করিতে যায়। ইহাতে তাহার ক্ষতি হয় এবং সে আর সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। বিভূতিপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি অহঙ্কার বা প্রতিষ্ঠার ভাব আসিয়া পড়ে তবেই উহা সাধনার অন্তরায় হয়। আর বিভূতি লাভের আনন্দ যদি সাধককে সাধন-পথে উৎসাহিত করিতে থাকে তবে দুই চারিটি বিভূতি আপনা হইতে প্রকাশ হইয়া পড়িলেও সাধকের কোন ক্ষতি হয় না। সে ক্রমে উচ্চ অবস্থা হইতে আরও উচ্চ অবস্থায় যাইতে পারে।

অহঙ্কার এবং প্রতিষ্ঠা সাধনার প্রধান অন্তরায়। উহা আসিলে বিভূতি আর থাকে না। তবে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, কেহ পূর্ণ বিভূতি লাভ না করিয়া, সাধনের শেষ পর্য্যন্ত না যাইয়া উহা অপরকে দিতে পারে না। কিছু শক্তিলাভ করিলেই উহা অপরকে দেওয়া যায়। যেমন এনট্রেন্‌স পাশ করিয়াও নীচের ক্লাশের ছেলেদিগকে পড়ান যায়। এইজন্য অনেক সাধু সাধনের চরম সীমাতে উপস্থিত না হইয়াও তাঁহাদের সাধনলব্ধ ধন নিজ নিজ শিষ্যদিগকে দান করিয়া থাকেন।

সাধকের যে বিভূতি বিকাশ হয় তাহারও কারণ আছে। বিভূতিলাভ সাধকের সংস্কার হইতেই হইয়া থাকে। তোমরা কি দেখ না যে, অনেকে বলে, "আমার যদি এরূপ শক্তি লাভ হয় যাহা দ্বারা আমি রোগ সারাইতে পারি, তবে আমি জগতে রোগজনিত দুঃখ একেবারে দূর করিয়া দেই।" অনেকে আবার নিজের সুনাম ও প্রতিষ্ঠার জন্য এই সব শক্তি আকাঙ্খা করে। তাহাদের ঐ সব আকাঙ্খা হইতে যে সংস্কারের সৃষ্টি হয় উহাই আবার সাধনপথে বিভূতিরূপে দেখা দেয়। সে দেখিতে পায় যে, সে এতদিন যে শক্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে উহা এখন তাহার করতলগত হইয়াছে। এই শক্তিই তখন সাধনার বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। ইহা হইতেই সাধকের পতন হইতে পারে। কিন্তু সাধক যদি ইহাতে আবদ্ধ না হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকে তবে এই সব বিভূতি লয় পায়। এখানে লয় পায় অর্থে বুঝিতে হইবে না যে, উহা নষ্ট হয়। বিভূতি তখন সাধকের স্বভাব হইয়া যায়।

প্রমথবাবু। বিভূতি লাভ করিলে যাহাতে পতন না হয় তাহার উপায় কি?

মা। ঐ যে বলিয়াছি যে একলক্ষ্যে থাকিতে হয়। লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধক চলিতে থাকিলে সাধকের আর পতন হয় না। বিভূতি আসিলেও যদি সাধক উহা লইয়া খেলা না করিয়া সাধনপথে চলিতে থাকে তবে বিভূতি আর তাহার অন্তরায়

হয় না। এইজন্য দেখা যায় যে, অনেক সময় সাধকের মাত্র দুই একটি বিভূতি প্রকাশ পাইয়াই উহা থামিয়া যায় এবং সাধক চরম অভীষ্টলাভ করে।

আমি। মা, বিভূতি স্বভাবে চলিয়া যাওয়ার অর্থ কি?

মা। মনে কর একজন দেবীসাধনা আরম্ভ করিল এবং এই সাধনার ফলে সে দেবীভাব লাভ করিল। এই লাভকে আমরা খণ্ড লাভ বলিব এবং ইহাতে যে বিভূতি প্রকাশ পাইবে উহাও খণ্ড বিভূতি। কিন্তু এই দেবীভাব যখন অখণ্ড রূপে লাভ হইবে তখনও বিভূতি থাকিবে। তাহাকে আমরা অখণ্ড বিভূতি বলিব। এই অখণ্ড বিভূতি বিভূতি নহে। ইহা স্বভাব। তাই উত্তম বিভূতি প্রকাশ হইতেছে স্বভাব বিভূতিময় হওয়া। স্বভাবই বিভূতি, বিভূতিই স্বভাব।

আমি। বিভূতিতে স্থিতি লাভ করা কি?

মা। খণ্ড বিভূতিলাভই বিভূতিতে স্থিতিলাভ। স্থিতিলাভ বলিলে ইহা বুঝিবে না যে, বিভূতি চিরস্থায়ী হইয়াছে, কারণ বিভূতি চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যেহেতু উহা সংস্কারের উপর নির্ভর করে। তবে আমরা এই অর্থে স্থিতি বলি যে, সাধক উহার উপর দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি আর সাধনপথে চলিতেছেন না। মনে কর তুমি দালানের ছাদে উঠিবে। ছাদে উঠিতে গেলে কতকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হয়। এখন মনে কর ছাদ হইল সাধকের চরম অভীষ্ট এবং সিঁড়িগুলি নানারকমের বিভূতি।

সাধক যদি ছাদে উঠিতে উঠিতে কোন সিঁড়ির উপর দাড়াইয়া থাকেন তবে আমরা বলিব যে, তিনি বিভূতিতে স্থিতিলাভ করিয়াছেন। তিনি আর সাধনপথে চলিতেছেন না। এই স্থিতিলাভ হইলেই আবার পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। পতন যে হয়ই তাহা নহে, তবে সম্ভাবনা থাকে।

ভূপতিবাবু মাকে যখন প্রশ্ন করেন তখন আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, মা'র উত্তর যদি অস্পষ্ট কিংবা সংক্ষিপ্ত হয় তবে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ী চলিয়া যাইব। মা আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবাজী, তুমি দাঁড়াইয়া আছ কেন? তুমি বুঝি এখন চলিয়া যাইবে তাই পেছনে দাঁড়াইয়া আছ?"

আমি। দেখি, কি হয়।

মা। বাবাজীর চলিয়া যাইবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে; ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। সেই সময় আসিলে বাবাজী আর কিছুতেই থাকে না।

নগেনবাবু। ভাল ভাল কথা হইতে থাকিলেই অমূল্যবাবু থাকেন। যখন বাজে কথা আরম্ভ হয় তখন তিনি চলিয়া যান।

মা। না, ভাল কথার মধ্যেও বাবাজী চলিয়া যায়। হয় ত অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু অপেক্ষা করে কিন্তু পরে চলিয়া যায়। ইহা বাবাজীর একটা গোঁ। ইহা ভাল। (আমাকে) আচ্ছা, বাবাজী, তুমি ঐরূপ কর কেন? বল। (হাসিতে হাসিতে) বল, আজ তোমাকে আমি বুঝিয়া লইব। কাজ থাকে

বলিয়া বুঝি চলিয়া যাও? না ভাব যে, মাতাজী বাড়ীতে বসিয়া আছেন? বল।

আমি। তুমিই ত বলিতেছ। আমি আর কি বলিব?

মা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "তবে আর বলিব না।"

ইহার পর ভূপতিবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বিভূতি সম্বন্ধে যে সব কথা উঠিয়াছিল তাহা বলিলেন। নিশিবাবু আমার কানে কানে আসিয়া বলিলেন, "মাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, সাধনে পতন হইলে আবার উঠা যায় কি না।"

আমি। মা, তোমার একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি সাধন করিতে করিতে কাহারও পতন হয় তবে আবার উঠা যায় কি না।

মা। পড়া থাকিলেই উঠা আছে। আসল জিনিষ ত উঠা-নামার বাহিরে। (নিশিবাবুকে) বাবা, তোমার প্রশ্ন তুমি কর না কেন?

আমি। দেখ, মা, লোকে যে কাছারীতে মামলা-মোকদ্দমা করে তাহা কিন্তু সে হাকিমের কাছে নিজেও করিতে পারে। তবুও লোকে উকিলের কাছে যায়। সেইরূপ তোমার কাছে যে লোকটা অনবরত বক-বক করিতে থাকে, প্রশ্ন করিতে হইলে লোকে তাহারই শরণাপন্ন হয়। ইহা স্বাভাবিক। ইহা শুনিয়া মা ও নিশিবাবু উভয়েই হাসিলেন।

মা। তুমিও গম্ভীর। তুমিও বেশী কথা বল না। আজকাল মাত্র দুই চারিটি কথা বলিতে শিখিয়াছ।

এই সব কথার পর মা প্রমথবাবুকে গান করিতে বলিলেন। প্রমথ বাবুও বেশ ভাব দিয়া তিনটি গান করিলেন। গান শেষ হইলে মা বলিলেন, "ভূপতি বাবা, এখন তুমি আস। অমূল্য বাবাও এখন আস।"

আমরা মাকে প্রণাম করিয়া সে দিনের মত বিদায় হইলাম।

১লা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪২ সন (ইং ১৭।১২।৩৫) সকালবেলা আশ্রমে যাইয়া দেখি শ্রীশ্রীমা মাঠে বেড়াইতে গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর মা ফিরিয়া আসিলেন। আমরা সকলে নামঘরে বসিলাম। সি. আই. ডি ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ধর মহাশয় মাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

জিতেনবাবু। সংসারে সুখী হওয়া যায় কিরূপে ?

মা। সং সাজিয়া থাকিলেই সংসারে সুখী হওয়া যায়। দেখ না লোকে নানারূপ বেশ ধরিয়া সং সাজে, কিন্তু সং সাজিলেও তাহারা নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া যায় না। আর আমরা ত সং সাজি না, সংকে আমরা সার করি। তাই আমরা সংসারী। যাহাদিগকে লইয়া আমরা সংসার করি তাহাদিগকে যদি সংএর সাজের মত অনিত্য বলিয়া বুঝিয়া লই তবেই আমরা সংসারে সুখী হইতে পারি।

জিতেনবাবু। আমরা যদি সংসার করিয়া সুখী হই এবং ইহা লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকি তবে দোষ কি ?

মা। আমি দোষের কথা বলিতেছি না। যদি উহাতে ডুবিয়া থাকা যায় তবে ত ভালই। কিন্তু ডুবিয়া থাকা যায় না। ডুবিতে গেলেই হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। দেখ না, তোমরা পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া বেড়াইতে যাও। কিছুক্ষণ পর তোমরা ঐ

পোষাকপরিচ্ছদের ভারেই অস্থির হইয়া উঠ। উহা ছাড়িবার জন্য হাঁপাইয়া উঠ এবং উহা ছাড়িয়া যেন সোয়াস্তি পাও। সেইরূপ মানুষ স্বভাবতঃই মুক্ত। সে মুক্ত থাকিতেই ভালবাসে। বন্ধন হইলেই সে অসোয়াস্তি বোধ করে। তাই সংসার করিতে আসিয়া সে সংসারে মজিয়া থাকিতে পারে না। সংসারের বন্ধন তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে। সে মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্‌ করে। আর একটা কথা। সকলেই শান্তি এবং আনন্দ চায়। মানুষের স্বভাবই আনন্দের স্বভাব। সে এই আনন্দে স্থিতি লাভ করিতে চায়। তাই সে আনন্দ খুজিয়া বেড়ায়। তাহার ভিতরে যদি এই আনন্দের জ্ঞান না থাকিবে, তবে সে আনন্দ খুজিবে কেন? অবাধ আনন্দের অনুভূতি তাহার মধ্যে আছে বলিয়াই ত সংসার-বন্ধন তাহাকে কষ্ট দেয়। জীব ভাবটা হইল বদ্ধভাব। এই বদ্ধভাব হইতে মুক্ত হইলেই জীব আনন্দে স্থিতিলাভ করে।

জিতেনবাবু। অনেকের মতে পূর্ব্বজন্ম নাই। আমরাও দেখিতেছি যে, আমরা পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম বা ছিলাম না তাহা আমাদের কিছুই স্মরণ নাই। আমরা এই জন্মের বৈষয়িক সুখ লইয়া মজিয়া থাকিব না কেন? ইহাই ত আমাদিগকে সুখ দিতেছে আমরা আবার ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিব কেন?

মা। কথাটা সত্য যে, পূর্ব্বজন্মে আমরা কি করিয়াছি তাহা আমাদের স্মরণ নাই; কিন্তু উহার একটা ছাপ আমাদের মধ্যে আছে। যেমন অনেক সময় এরূপ হয় যে, কখন কি ভাবে আমাদের হাত পা পুড়িয়া গেল তাহা আমাদের মনে থাকে না,

কিন্তু ঘা-টা থাকিয়াই যায়। উহা আমাদিগকে যন্ত্রণা দেয়। সেইরূপ পূর্ব্বজন্মে কি করিয়াছি না করিয়াছি তাহা মনে না থাকিলেও, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মজনিত একটা যন্ত্রণা আমাদের আছে। ইহা ছাড়া স্মৃতি বলিয়া আমাদের একটা জিনিষ আছে, অর্থাৎ আমাদের এমন একটা অবস্থা ছিল যখন আমাদের কোন জ্বালা-যন্ত্রণা ছিল না, সেই অবস্থার একটা স্মৃতি আমাদের আছে। তাই আমরা জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি চাই। তাহা না হইলে শান্তি ও মুক্তির খোঁজ করিতেই পারিতাম না। তুমি যদি এই সংসার লইয়া সুখী হইতে পারিবে তাহা হইলে তোমার অভাব বোধ হইবে না। কিন্তু তুমি আজ যে সব প্রশ্ন করিতেছ উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তোমার অভাব বোধ আছে। তাহা না হইলে এ সব প্রশ্ন উঠে কেন? দেহ-ধারণ করিলেই দেহের ভোগ আছে। পোষাক পরিলেই পোষাকের যন্ত্রণা হয়। অন্ততঃ পোষাক রক্ষা করিবার একটা চিন্তা হয়। উহাই তখন যন্ত্রণা দিতে থাকে। সংসার করিতে আসিলে জ্বালা-যন্ত্রণা আসিবেই। তাই চেষ্টা করা উচিত যে যাহাতে এই যন্ত্রণা হইতে সাময়িক ভাবে নয়, চিরদিনের জন্য শান্তি লাভ করা যায়।

জিতেনবাবু। এই সংসারে থাকিয়া যদি সংসারের সুখটাকেই ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করি তবেই ত সব হইয়া যায়।

মা। ধরিতে চেষ্টা করিলেই হারাইতে হয়। আমি যে সুখের কথা বলিতেছি তাহা ধরা যায় না। তাহা আপনি হয়

এবং চিরদিনের জন্য থাকিয়া যায়। এখানে আনন্দ চেষ্টাসাপেক্ষ নয়। আনন্দ ইহার স্বভাব। বিষয়ের আনন্দ চেষ্টাসাপেক্ষ এবং তাহা খণ্ড ও ক্ষণস্থায়ী। আর সচ্চিদানন্দের আনন্দ চিরস্থায়ী। অবশ্য আমাদিগকে এ আনন্দও ছাড়িয়া উপরে উঠিতে হইবে। সে পরের কথা। এখন এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা সংসারে যে আনন্দ পাইতেছি উহা হইতে স্থায়ী আনন্দ আমাদের ভিতরেই আছে। উহাতেই আমাদের স্থিতি লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত।

জিতেনবাবু। তবে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মটা কি কিছু নয়?

মা। কে বলিল কিছু নয়? উহা না থাকিলে আমরা আসিলাম কোথা হইতে? কিছুই ত আকাশ হইতে পড়ে না বা মাটি হইতে গজাইয়া উঠে না। কিন্তু আমরা ঠিক ঠিক গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতে পারি কই? পূর্ব্বে চারিটি আশ্রম ছিল। তাহার প্রথমটি হইতেছে ব্রহ্মচর্য্য। এখন উহা নাই বলিলেই চলে। উহা না থাকাতে সমস্ত আশ্রমই গণ্ডগোল হইয়াছে। গার্হস্থ্য অর্থে আমি গৃহকে হস্তগত করা বুঝি। কিন্তু আমরা ত গৃহকে হস্তগত করি না, গৃহই আমাদিগকে হস্তগত করিয়াছে।

জিতেনবাবু। শান্তি-লাভের দুই পথ আছে, যেমন প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ। আমরা নিবৃত্তিমার্গে যাইব কেন?

মা। মার্গ মাত্র একটাই। নিবৃত্তিমার্গও প্রবৃত্তিমার্গ। তাই আমি বলি যে ত্যাগ বলিয়া কিছু নাই। আছে কেবল

ভোগ। মানুষ কেবল খণ্ড ভোগ হইতে পরিপূর্ণ ভোগের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এই সময়ে ৭॥ টা বাজিয়া গেল আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া কলেজে চলিয়া গেলাম। বিকাল বেলা আশ্রমে যাইয়া দেখিলাম যে, মেয়েরা মাকে এমন ভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন যে, সেই নারীব্যূহ ভেদ করিয়া কোন পুরুষের মা'র কাছে যাইবার শক্তি নাই। মাঠে বসিয়া আমরা নিজেরাই গল্প করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মতিবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম মতিবাবু প্রাতে সিদ্ধেশ্বরী-আশ্রমে ৺শিবের ঘরে জুতা পায়ে দিয়া ঢুকিয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছেন। এইরূপে ঢুকিবার সময় কাহারও নিষেধ গ্রাহ্য করেন নাই।

মতিবাবুর সঙ্গে আমরা আলাপ করিতে লাগিলাম। তিনি কি ভাবে মা'র আকর্ষণের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন সেই কথাই বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "ছোট বেলা হইতেই আমি মাতৃহীন। তাই মাতৃস্নেহের জন্য আমি চিরদিন বুভুক্ষু। অবশ্য আমি একথা বলিতেছি না যে, আমি ছোট বেলা আমার আপন-জনের আদর পাই নাই। আদর খুব পাইয়াছি। কিন্তু উহার আতিশয্যই যেন আমাকে স্মরণ করাইয়া দিত যে, উহা আন্তরিকতাশূন্য। পাছে মা'র কথা আমার মনে হয় সেইজন্যই বোধ করি লোকে আমাকে কিছু বেশী বেশী আদর করিত।

একদিন প্রমথবাবু আমাকে আনন্দময়ী মায়ের কথা বলিলেন। আমি প্রথম হইতেই ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে, আমি আনন্দময়ীকে 'মা' বলিব না, বা প্রণাম করিব না। কিন্তু ইনি আমাকে প্রায় জোর করিয়া মা বলাইয়াছেন।

"মা দেখিতে যে সুন্দরী তাহা নহে। আমি অনেক সুন্দরী মেয়ের ছবি বিলাতে দেখিয়াছি। লুভারে যে সব ছবির সংগ্রহ আছে তাহাও আমি দেখিয়াছি। তাহাদের তুলনায় মা সুন্দরী নহেন। কিন্তু তবুও ইঁহার মুখে এমন একটা সারল্য-মণ্ডিত স্নিগ্ধ ভাব আছে যাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। আর ইঁহার হাসিও এক অপূর্ব্ব বস্তু। এমন সরল খল্ খল্ হাসি দেখা যায় না। এ হাসিতে যেন মা'র প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যোগ দেয়।

"প্রথম দিন আসিয়া মার সঙ্গে খুব তর্ক করিয়াছি কিন্তু পরে আর কোন কথা বলি নাই। ইহাতে মা বলিয়াছেন যে, তিনি আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটা ফাঁকা কথা। আমি ইচ্ছা করিয়াই কথা বলি না। আমি নির্ব্বাক হইয়া ইঁহার দেবদুর্লভ রূপ দর্শন করি। ইনি যে কি কথা বলেন তাহা আমার কানে আসে না।

"গত সোমবার দিন কোর্টের কাজ শেষ হইলে আমি প্রমথবাবুর সহিত আশ্রমে আসি। প্রমথবাবুর মেয়ে আমাকে একটি গোলাপফুল দেয়। আমি ঐ ফুলটি আবার মাকে দেই। মা ফুলটা হাতে লইয়া অন্যান্য সকলকে বলিলেন, "যে আমাকে 'মা' ডাকিবে না বলিয়া ঠিক করিয়াছে সে-ই আমাকে এই ফুলটা দিয়াছে।" পরে মা ফুলটা বেবীদিদির হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আমার আদরের ফুল। ইহা যত্ন করিয়া রাখিও"। এই বলিয়া তিনি একটা গল্প বলিলেন। তাহাতে জানিলাম যে, মা নাকি একজনকে একটা ফুলের তোড়া দিয়াছিলেন। সে নাকি উহা তালা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তবু তোড়াটা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। এ সব বাজে কথা। যাক্, বেবীদিদিকে ঐ ফুলটা দিতে দেখিয়া আমার খুব রাগ হইল। ভাবিলাম, "তুমি যদি আমার মা হইবে তবে আমি তোমাকে যাহাই দেই না কেন তুমি তাহা আদর করিয়া রাখিবে। এখন

দেখিতেছি তুমি উহা অন্যকে দিয়া দিলে। এই রাগের বশেই আমি বেবীদিদিকে বলিলাম, 'আপনি বাড়ী যাইয়া ঐ ফুলটা পায়খানায় ফেলিয়া দিবেন'। আমার ঐ কথা শুনিয়া মা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে বেবীদিদিকে বলিলেন, "ফুলটা আমাকে দাও, আমি খাইয়া ফেলি।" বেবীদিদি একটা পাপড়ি-ছিড়িয়া মা'র মুখে দিলেন। মা তখন সকলকেই এক একটি পাপড়ি দিতে বলিলেন। বেবীদিদি শেষে বোঁটাটা চিবাইয়া খাইয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া ভাবিলাম ইনি যখন আমার দেওয়া ফুলটা এত আদর করিয়া খাইয়া ফেলিলেন তখন নিশ্চয়ই ইনি আমার মা।

"আজ সকাল বেলাও মা'র কাছে গিয়াছিলাম। আমি জুতা পায়ে দিয়াই শিবের ঘরে প্রবেশ করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসিয়াছি। বৈকাল বেলা মাকে দুইটি টাকা দিয়াছি। টাকা মা'র হাতে দিতে গেলাম, মা নিলেন না। অখণ্ডানন্দ স্বামীজী বলিলেন যে, মা টাকা স্পর্শ করেন না। আমি তখন টাকা দুইটি ছুড়িয়া মায়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম। ঐ দুইটি টাকার মধ্যে একটি বোবা টাকা। শাস্ত্রে আছে এক গাছে দুইটি পাখী থাকে, তার একটি ফল খায়, আর একটি চাহিয়া চাহিয়া দেখে। আমার টাকা দুইটাও ঐ রকম। যে-টা বাজে, সে-টা হইল সেই পাখী যে ফল খায়; আর বোবাটি হইল সেই পাখী যে ফল খায় না, শুধু বসিয়া দেখে।"

আজ আর মার সঙ্গে কথা বলিবার কোন সুযোগ হইবে না দেখিয়া মাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

২৭শে পৌষ, বুধবার, ১৩৪২ সন, (ইং ১৮।১২।১৫) সকাল বেলা আশ্রমে যাইয়া ঢাকার Health officer শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে দেখিলাম। শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু এবং মতিবাবুও উপস্থিত ছিলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীমা মাঠে বেড়াইতে গেলেন। আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ

চলিলাম। প্রমথবাবু মাকে লইয়া সকলের আগে আগে যাইতেছিলেন। আমি মনে করিলাম তাঁহার বুঝি কোন গোপনীয় কথা আছে। কিন্তু প্রমথবাবু ইঙ্গিত করিয়া আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। প্রমথবাবু বলিতেছিলেন, "মা, মতিকে আমি তোমার নিকট লইয়া আসিয়াছি। এখন যদি তাহার কোন অমঙ্গল হয় তবে যে তোমার দুর্নাম হইবে। আমি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। তুমি মতিকে দেখিও।" প্রমথবাবুর এই কথা শুনিয়া আমার জ্যোতিষবাবুর কথা মনে পড়িল। একদিন রাত্রিবেলা বারিক মাইর খারাপ অবস্থা দেখিয়া জ্যোতিষবাবুরও এইরূপ ভয় হইয়াছিল। একেই ত হৃষীকেশে রটিয়া গিয়াছিল যে, মা যাদু জানেন। ইহার পর যদি বারিক মাই মা'র কাছে থাকিয়া মরিয়া যান, তবে বড় দুর্নাম রটিবে; এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্যোতিষবাবু সে দিন ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। প্রমথবাবুর কথা শুনিয়া মা আমার দিকে তাকাইলেন; মা'র দৃষ্টিতে মনে হইল আমি কি চিন্তা করিতেছি তিনি বুঝিয়াছেন। আমরা হাসিয়া উঠিলাম। মনে মনে প্রমথবাবুকে কিন্তু প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরদুঃখে যাহার প্রাণ গলিয়া যায় তিনি যে অতি মহৎলোক ইহাতে সন্দেহ কি?

এমন সময় মতিবাবু আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এখন আমি যাইব কি?"

মা। তোমার যা' ইচ্ছা।

মতিবাবু। আমার যাইবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু ঐ একজন (অর্থাৎ প্রতাপবাবু *) আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ও এখানে আসিবেও না আর আমাকে না লইয়াও যাইবে না।

---

* প্রতাপবাবু মতিবাবুর ভগিনীপতি।

আমি। মা, আমি প্রতাপবাবুকে তোমার কাছে ডাকিয়া আনিব?

মা। তোমাদের কাছে আমি মা, সে ত আর আমাকে মা বলিবে না।

যাহা হউক প্রতাপবাবুকে মা'র নিকট ডাকিয়া আনা হইল।

মা। (প্রতাপবাবুকে) বাবা, তুমি ত আমাকে মা বলিবে না; কিন্তু আমি তোমার মেয়ে। মেয়ের একটি অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে।

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে প্রতাপবাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে হাত দিয়া স্পর্শ করিলেন। ঐ ভাবে মাকে স্পর্শ করিতে দেখিয়া আমি প্রতাপবাবুকে খুব ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলাম। কারণ মা স্বেচ্ছায় কাহাকেও স্পর্শ করেন না।

মা। (হাসিতে হাসিতে) বল বাবা, এই মেয়েটির একটি কথা রাখিবে? তুমি যেমন সংসারের নানা কাজে মন দাও সেইরূপ অল্প একটু সময় তাঁহার কাজেও মন দিবে। তোমরা তোমাদের ডিউটি (duty) * পালন কর না? সেইরূপ তাঁহাকে ডাকাও একটা ডিউটি মনে করিবে। বল, বাবা, ইহা করিবে? তোমার এই পাগল মেয়ের কথা রাখিবে?

প্রতাপবাবু। আমি চেষ্টা করিব।

মা। চেষ্টা নয়, বল, নিশ্চয় করিবে? দেখ না, তোমরা যাহা করিতেছ তাহা ত অভাবের কাজ। খাওয়া-দাওয়া, বেড়ান, অর্থ

* শ্রীশ্রীমা আজকাল মধ্যে মধ্যে দুই একটি ইংরাজী শব্দ বলেন। পশ্চিমে থাকিয়া থাকিয়া হিন্দীও বেশ বলেন।

উপার্জ্জন—এ সব গুলিই অভাবের কাজ। ইহাতে অভাব কেবল বাড়িয়াই যায়। তাঁহাকে ডাকিলে অভাব থাকে না। তখন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। যাহা কিছু করিতেছ তাহাও তাঁহারই কাজ; কারণ জগতে কেবল তিনিই আছেন। পত্নী-রূপেও তিনি, কর্ত্তব্যরূপেও তিনি। কিন্তু এদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। তাই বলি, যেমন সংসারের সকল কর্ম্ম নিয়মানুযায়ী করিতেছ, সেইরূপ নিয়মমত কিছুক্ষণ তাঁহাকে ডাকিবে। কেমন, পারিবে না, বাবা?

প্রতাপবাবু। আচ্ছা, ডাকিব।

মা। (মতিবাবুকে) বাবা, তোমাকেও বলি যে, তুমি এদের (অর্থাৎ প্রতাপবাবুদের) কথা শুনিবে। কখনও অবাধ্য হইবে না। আর নিজকে খুব শান্ত ও স্থির ভাবে রাখিতে চেষ্টা করিবে। তুমি সব সময় তোমার ভাবটা স্থির রাখিতে পার না। স্থির ভাবে কোন কাজ না করিলে কিছু হয় না।

মতিবাবু। আমি ত এদের কথা শুনি। আর তুমি আমাকে স্থির করিয়া দাও না?

মা। নিজকে নিজে স্থির করিতে চেষ্টা করিবে। শান্ত ভাব না আসিলে কি শান্তি পাওয়া যায়?

এই বলিয়া মা অগ্রসর হইলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। প্রতাপবাবু ও তাঁহার স্ত্রী বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

আশ্রমে ফিরিয়া দিদিমার সঙ্গে দেখা হইল। গতকল্য দিদিমা ৺ব্রহ্মাকালী পূজা করিয়াছেন। এ পূজা সাধারণতঃ শ্মশানেই হয়।

কিন্তু মা'র ইচ্ছায় ইহা আশ্রমে হইয়াছে এবং বাবা ভোলানাথ পূজা করিয়াছেন।

আমি। (দিদিমাকে) দিদিমা, আমার প্রসাদ আছে ত?

দিদিমা। প্রসাদ ত আছে, কিন্তু তুমি উহা খাইবে কি?

আমি। এ কি কথা? প্রসাদ খাইব না কেন?

দিদিমা। খিচুরী প্রসাদ, তাহাতে আবার উহা ঠাণ্ডা, তাই বলিতেছিলাম যে, তুমি খাইবে কি না।

আমি শিবশঙ্করবাবুকে লইয়া ভোগের ঘরের নিকট প্রসাদ খাইতে বসিলাম। দিদিমা অনেকগুলি খিচুরী দিলেন। আমি খাইতেছি এমন সময় মা কোথা হইতে আসিয়া বলিলেন, "বাবা, আমাকে একটু দিবে?" মা'র কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি যে, মা ততক্ষণ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। শিববাবু মাকে আসিতে দেখিয়াছিলেন কাজেই তিনি মায়ের কথায় বড় বিস্মিত হ'ন নাই। কিন্তু আমি হঠাৎ মা'র কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

ইহার পরই মায়ের ভোগের পালা আরম্ভ হইল। কত লোক যে মিষ্টান্ন, কমলালেবু ইত্যাদি লইয়া মাকে ভোগ দিতে আসিল তাহার ঠিকানা নাই। এক এক জনের ভোগ হইয়া যায় আর আমরা প্রসাদ পাই। সকাল বেলাটা কেবল ভোজন করিয়া কাটাইলাম।

প্রায় ৮টার সময় মা নামঘরে আসিলেন। একটি মেয়ে মাকে গান শুনাইল। বেশ মধুর গান। গান শুনিয়া নগেনবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন। বেলা হইতেছে দেখিয়া আমি মাকে প্রণাম করিয়া কলেজে চলিয়া গেলাম।

বৈকাল বেলা আশ্রমে যাইয়া দেখি যে, লোকে লোকারণ্য। আজ খিচুরী ও মিষ্টান্ন দিয়া মাকে ভোগ দেওয়া হইয়াছে। এই ভোগ উপলক্ষ্যেই

বোধ হয় এত ভিড়। প্রমথবাবু এবং মতিবাবুকেও দেখিলাম। শুনিলাম মা নাকি মাঠে গাছতলায় শুইয়াছিলেন, এক বৃদ্ধা মাকে ভোগ দিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। তিনি সকলকে অনুরোধ করিতে-ছিলেন যে, কেহ যদি মাকে ডাকিয়া দিত তবে তিনি ভোগ দিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন। বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার বিশেষ দরকার। মাকে উঠাইয়া দিতে মতিবাবু নাকি প্রথমে ভ্রমরকে অনুরোধ করেন, ভ্রমর সম্মত না হইলে মতিবাবু নিজে মাকে তুলিয়া দেন। শুনিলাম মা উঠিয়া আর কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন।

খুকুনীদিদিকে ভ্রমরের সহিত গল্প করিতে দেখিলাম। তিনি ও জ্যোতিষবাবু আজ চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছেন। খুকুনীদিদির মুখে ৺তারাপীঠের বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলাম। শুনিলাম যে, এবার একদিন তারাপীঠে মা'র ভীষণ অবস্থা হইয়াছিল। তিনি কখনও কাঁদিতেছিলেন কখনও হাসিতেছিলেন। মা'র এই ভাব দেখিয়া সকলের প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল ; কারণ মা'র এরূপ ভাব ইঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখেন নাই। মা নাকি বলিতেছিলেন যে, তাঁহার শরীর কেমন কেমন করিতেছে। পরে ৺তারামন্দিরে যাইয়া মা অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া রহিলেন। শেষে উঠিয়া বসিয়া খুকুনীদিদিকে বলিলেন, "তোমরা যদি আমাকে দেহে রাখিতে চাও তবে যাহা বলি তাহা পালন করিও।" এই রকম কথা শুনিয়া সকলে অত্যন্ত ভীত ও বিষণ্ণ মনে মাকে নীরবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে এই ভাব কাটিয়া গেলে মা বলিলেন, "চল, কীর্ত্তন শুনা যাক্"। এই সময়ে নাটমন্দিরে খুব ধূমধামের সহিত কীর্ত্তন চলিতেছিল। মা কীর্ত্তনের নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া আবার উঠিলেন এবং জ্যোতিষবাবুর নিকট যাইয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে এখনই চট্টগ্রাম যাইতে

হইবে। জ্যোতিষবাবু শারীরিক অসুস্থতার অজুহাৎ দেখাইলেন। মা বলিলেন, "তোমার শরীর ভাল না থাকিলে খুকুনীকে সঙ্গে নাও। এখনই তোমাকে যাইতে হইবে।" মা অখণ্ডানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, খুকুনীকে জ্যোতিষের সঙ্গে দিতে তোমার কি কোন আপত্তি আছে ?"

স্বামীজী। মা, তোমার আদেশ, এতে আপত্তি করিবার কি আছে ? তবে জ্যোতিষ যখন অসুস্থ একজন বেটাছেলে সঙ্গে গেলে ভাল হয়।

মা। খুকুনীই ত পুরুষ। ও ব্রহ্মচারী। পুরুষ বই আর কি ?

রাত্রিবেলা এই ঘটনা হয়। মা তখনই পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সকাল বেলা তোমাকে যে গাড়ী প্রস্তুত রাখিতে বলিয়াছিলাম তাহা রাখিয়াছ কি" ?

পাণ্ডা। হাঁ মা, গাড়ী প্রস্তুত। আদেশ পাইলেই উপস্থিত করিতে পারি।

তাহাকে গাড়ী আনিতে বলা হইল। দিদি বলিলেন, "আমরা দুইটি প্রাণী নীরবে গাড়ীতে যাইয়া বসিলাম। এ সময় মা'র এরূপ একটা ভাব দেখা গেল যে, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাধা দিতে আসিলেও বোধ করি মা'র ইচ্ছা রোধ করিতে পারিত না।"

খুকুনীদিদি আরও বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় নগেনবাবু দিদিকে ডাকিয়া আশ্রমের ভিতরে লইয়া গেলেন। দিদির কথা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। এতদিনে বুঝিতে পারিলাম যে, বাবা ভোলানাথ সেদিন কেন মাকে মন্দিরের বারান্দায় শুইতে দিতে এত আপত্তি করিতেছিলেন। তিনি ভয় করিতেছিলেন, পাছে মা ঐখানে দেহত্যাগ করিয়া ফেলেন। ৺তারাপীঠে মায়ের অবস্থা দেখিয়া, সকলে তখন ঐরূপ একটা আশঙ্কা

করিয়াছিলেন। বাবা যে আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই আপত্তি করিতেছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাঠেই কাটাইলাম। সন্ধ্যার পর চিন্তাহরণবাবুর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মা স্ত্রীলোক দ্বারা পরিবৃত হইয়া কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। আমরাও যাইয়া নামঘরে দাঁড়াইলাম। সেদিন কীর্ত্তন মোটেই জমিতে ছিল না। সকলেই মা'র কথা শুনিতে ব্যগ্র, কীর্ত্তন শুনিবে কে?

৩রা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ সন, (ইং ১৯।১২।৩৫) মায়ের ঢাকা হইতে পুনরায় বিদায়ের দিন। সকাল বেলা হইতেই আশ্রমে লোকসমাগম। ভোর বেলা যাইয়া মাকে ৺অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় বসা দেখিলাম। অনেকেই মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। আমি যাইয়া এক পার্শ্বে বসিলাম। একটি ছেলে মাকে প্রশ্ন করিতেছিল।

জাতিভেদ

ছেলে। আমরা শাস্ত্রে জাতিভেদ দেখি। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, সকল মানুষই সমান। মানুষে মানুষে এরূপ ভেদবুদ্ধি ভাল নয়। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, জাতিভেদ না মানিলে পাপ হয় কি না।

মা। শাস্ত্রের কথা যদি তুমি মানিতে না চাও তবে নিজেই শাস্ত্র তৈয়ার কর না কেন?

ছেলে। আমাদের সে ক্ষমতা নাই, তবে জানিতে চাই যে, জাতিভেদ না মানিলে পাপ হয় কি না।

মা। সন্দেহ থাকিলেই পাপ।

ছেলে। জাতিভেদ না মানা যে দূষণীয় নয় এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

মা। (হাসিয়া) তুমি ত ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ।

স্বামী শঙ্করানন্দ। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সন্দেহ থাকিবেই।

মা। সন্দেহ না থাকিলে প্রশ্ন করিতেছ কেন? সংশয় না থাকিলে জিজ্ঞাসা আসে না। সংশয় থাকিলেই পাপ-পুণ্যের কথা উঠে।

শ্রীশ্রীমাকে দেহে রাখার ভার আমাদের উপর

এমন সময় প্রমথবাবু বলিলেন, "মা এখন কাজের কথা হউক। তুমি আবার ঢাকায় আসিবে কি না বল?"

মা। তোমরা যদি আন তবেই আসিব।

প্রমথবাবু। এসব ফাঁকা কথা শুনিতে চাই না। তুমি নিশ্চয় করিয়া বল যে, তুমি আসিবে কিনা।

সুরেনবাবু।* আপনি গতবার বলিয়া গিয়াছিলেন যে আবার আসিবেন। এবারও কিছু বলিয়া যান।

মা। আমি কি বলিয়াছিলাম যে, আমি আবার আসিব?

সুরেনবাবু। হাঁ।

মা এ কথার কোন জবাব দিলেন না। আমি বুঝিলাম যে, সুরেনবাবু ভুল করিয়াছেন। ভবিষ্যতে কি করিবেন না করিবেন এরূপ ইঙ্গিত মা কদাচিৎ দিয়া থাকেন।

---

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি পোষ্ট আফিসে চাকুরী করেন।

মা। আমি আবার আসিব একথাও বলি না, আর আসিব না এ কথাও বলি না। আমি ত বলি যে, যদি এই দেহ থাকে এবং তোমরা যদি আন তবে আসিব।

আমি। ইচ্ছা করিলে কি দেহে থাকা যায় না?

মা। উহা তোমাদের ইচ্ছা।

আমি। আমরা কেমন করিয়া তোমাকে দেহে রাখিতে পারি?

মা। পিতামাতা কিরূপে সন্তানকে রক্ষা করে? সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়াই তাহাদিগকে রক্ষা করে।

উত্তর শুনিয়া আমি মনে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। মা'র দেহ-রক্ষার ভয় আমার কাটিয়া গেল। আমি ভাবিলাম আমারা যতদিন চাহিব ততদিন মা আমাদের কল্যাণের জন্য দেহে থাকিবেন। তাঁহার দেহে থাকা না থাকা সবই তাঁহার সন্তানদের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে।

ভিড় বেশী হইতেছে দেখিয়া প্রমথবাবু মাকে নামঘরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। মা সম্মত হইলেন। আমরা সকলে নামঘরে গিয়া বসিলাম।

শাস্ত্রজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান

সকলে আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাকে প্রশ্ন করিলেন, "মা, নির্দ্দোবানন্দ, যিনি এই আশ্রমে কিছুদিন কঠোপনিষদ পাঠ করিয়াছিলেন, আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন সর্ব্বদা চিন্তা করিতে চেষ্টা করি, "আমিই সেই পরমাত্মা।" কিন্তু এ ভাবটা আমাদের আসে না। উহা ব্যতীত আমরা বিরাট পুরুষের কোন অনুমানও

করিতে পারি না। কিছু ধ্যান করিতে গেলে এখন তোমার মূর্ত্তি মনে পড়ে। গতরাত্রে আমার নিদ্রা হয় নাই কেবল তোমার উপদেশ চিন্তা করিয়াছি এবং তোমার মূর্ত্তিই চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এমতাবস্থায় আমিই যে সেই পরমাত্মা এরূপ ধ্যান করিব কি করিয়া ?

মা। পরমাত্মা অনুভূতির বিষয়। শাস্ত্র পড়িয়া বা কথা শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় না। শাস্ত্র পথ বলিয়া দেয় মাত্র। শাস্ত্রকে আমি বলি স্ব অস্ত্র। শাস্ত্রে নানা মত আছে। উহার প্রত্যেকটিই সত্য। ঋষিগণ সাধনা করিয়া যাহা অনুভব করিতে পরিয়াছেন তাহাই শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। যিনি যে অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন তিনি তাহার বর্ণনাই শাস্ত্রে রাখিয়া গিয়াছেন। উহা কেবল পাঠ করিলে বা শুনিলে বুঝা যায় না। কিন্তু যখন তাঁহাদের ঐ সকল অবস্থায় পোঁছা যায় তখনই শাস্ত্রের ঠিক ঠিক অর্থ ধরা যায়। এইজন্য সমস্ত শাস্ত্রই সত্য।

দেখ, পূর্ব্বে আমাদের চারিটি আশ্রম ছিল। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে শাস্ত্র পাঠ করিয়া লোকে জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানিয়া নিত। ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া সংসার-আশ্রমে থাকিত এবং সংসারে থাকিয়া ঐ সব জ্ঞানকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিত। সংসারের কার্য্য শেষ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র হইতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহা অনুভবের বিষয় করিতে চেষ্টা করিত। তাহা হইলেই সন্ন্যাসধর্ম্ম লাভ হইত। কিন্তু

এখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটির অভাবে সমস্ত উলটপালট হইয়া গিয়াছে। অভাব আর আমাদের যাইতেছে না।

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, তোমরা ত অভাবের স্বভাবে আছ। তোমরা যাহা কিছু লইয়া আছ সবই ত অস্থায়ী। চাকুরী করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ, সংসারের কাজে উহা ব্যয় হইতেছে। কিছুই থাকে না। গতকল্য এ দেহের ফটো তোলা হইল। আমি বলিলাম, "এই দেহের ফটো দিয়া কি হইবে? ইহাও পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাহা আছে দুই দিন পর উহার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে"। যাহা থাকে না তাহা লইয়া থাকাই হইতেছে অভাবের স্বভাব। যাহা চিরস্থায়ী তাহা পাইতে চেষ্টা করা উচিত। এবং তাহা পাইতে হইলে একলক্ষ্য হওয়া দরকার। এই একলক্ষ্য হইতে হইলে 'সবই আমি' অথবা 'সবই তুমি' ইহার একটি ভাব লইয়া থাকা দরকার। পরে দেখা যায় যে কেবল এক বস্তুই জগতে আছে। আর কিছুই নাই। অথবা জগতের সমস্ত বস্তুতেই তিনি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান আছেন।

তাই আমি বলি যে, জীবভাব হইতেছে বদ্ধ ভাব। যেমন মাঠের মধ্যে বেড়া দিয়া কতকটা জায়গা ঘেরাও করা, কিন্তু এ বেড়াটা মাঠের মধ্যেই। সেইজন্য আমি আরও বলি যে, জীবের মধ্যে অজ্ঞানের পরদা থাকিলেও উহাতে আবার জ্ঞানের দরজা আছে। যেমন আমরা ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি। দরজা-জানালা দিয়া সূর্য্যের আলো আসিতেছে। আমরা রোদ দেখিতে পাইতেছি

কিন্তু উহা আমাদের গায়ে লাগে না। ইচ্ছা করিলে আমরা দরজা দিয়া বাহির হইয়া আবার রোদে যাইয়া দাড়াইতে পারি। জীবেরও বদ্ধভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য অনেক দরজা আছে। গুরু বল, মূর্ত্তি বল, এসব দরজা। ইহার ভিতর দিয়াই বদ্ধভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কেবল চাই একলক্ষ্য হওয়া। সকলই পরমাত্মার বিকাশ। সেইজন্য গুরুকে ভগবান্ ভাবিতে হয়। গুরুকে মানুষ ভাবিলে, গুরু যে ভগবান্ এ বুদ্ধি না হইলে কিছুই হইবে না। সেইরূপ দেবমুর্ত্তিকে শিলা ভাবিলে, কিছুই হইবে না। সেইজন্য আমি বলি জীব কখনও ভগবান্ হইতে পারে না। জীব ত জীবই। আবার যখন উহাকে ভগবান্ ভাবি তখন উহা ত ভগবানই। সেইরূপ গুরুকে যখন ভগবান্ ভাবি তখন তিনি ভগবানই। আবার তাঁহাকে যখন মানুষ ভাবি তখন তিনি মানুষই। যাহাকে লইয়া একলক্ষ্য হইবে তাহাতেও ভগবদ্‌বুদ্ধি থাকা চাই।

আজকাল মায়েরা লক্ষীপূজা করে। উদ্দেশ্য যেন খুব টাকা-পয়সা হয়। তোমরা সরস্বতী পূজা কর, যেন তোমাদের বিদ্যা হয় এবং টাকাপয়সা উপার্জ্জন করিয়া সুখে সংসার করিতে পার; কিন্তু আমি বলি এ ভাবে পূজা করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ এ সব বিদ্যা ও ধন চিরস্থায়ী নয়। এ পূজা অভাবেরই পূজা। পূজা করিতে হইলে লক্ষ্মীপূজা না করিয়া মহালক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। তাহাতে যে ধন লাভ হয় তাহার ক্ষয় নাই। সেইরূপ

সরস্বতীপূজা না করিয়া মহাসরস্বতীর পূজা করিতে হয়, যাহাতে আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইতে পারে। তাহা হইলেই আমরা অভাবের রাজ্য হইতে স্বভাবের রাজ্যে পৌঁছিতে পারিব। এই স্বভাবের রাজ্যে পৌঁছিতে হইলে নিজকে যন্ত্র করিতে হয়। তখন বুঝা যায় যে, জগতে কেবল একমাত্র তিনিই আছেন এবং তিনিই সব করিতেছেন।

সেইজন্য আমি বলি সকলে সর্ব্বদা নাম করিতে থাক। যে দিন যায় তাহা আর আসিবে না। কিছু হইল না বলিয়া নিরাশ হইতে নাই। কারণ কিছু হইল না এই ভাবই প্রমাণ করিতেছে যে কিছু হইতেছে। চাই কেবল অভাব বোধ। আমার নাম হইতেছে না, আমি ঠিক মত নাম করিতে পারিতেছি না, কি করিলে আমি ঠিক ঠিক নাম করিতে পারিব? এইরূপ খুব একটা অভাব বোধ হইলেই সিদ্ধি হাতের কাছে আসিয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের যে অভাব বোধই নাই। আমাদের ক্ষুধাই যে নাই! তোমাদের ক্ষুধা না থাকিলে তোমরা যেমন ঔষধ খাইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি কর, ভগবানের নাম করাও সেইরূপ। নাম করিতে করিতেই অভাব বোধ হয় এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য লোকে অস্থির হইয়া পড়ে।

এই সময় মাকে দেখিবার জন্য দুই তিনটি বেশ্যা আসিল। তাহারা আসিয়া মা'র সম্মুখে অন্যান্য মেয়েদের মধ্যেই বসিয়া গেল। ইহা দেখিয়া প্রমথবাবু বলিলেন, "আমি ইহাদিগকে মেয়েদের সহিত বসিতে দিব না।"

এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাদের স্থানে অন্যান্য মেয়েরা আসিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় দিদিমা আসিয়া গণ্ডগোল আরম্ভ করিলেন। মা'র কথা বন্ধ হইয়া গেল। মা প্রমথবাবুর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেমন বাবা, এখন হইয়াছে ত ?" মা'র কথার অর্থ বুঝি এই যে, বেশ্যাকে বেশ্যা বলিয়া ঘৃণা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। মা'র কথা শুনিয়া আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম।

বেশ্যা দুইটি অন্য দিক দিয়া ম'ার কাছে যাইয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের রোগের কথা বলিতে লাগিল। মা তাহাদিগকে বলিলেন, "এ দেহ হইতে ওসব কথা বাহির হয় না। এ দেহটা বড় অবাধ্য। মাগো, আমি তোমাদিগকে বলি যে, তোমরা তাঁহার নাম কর।"

এমন সময় স্বামী শঙ্করানন্দ আসিয়া বলিলেন, "মাকে পাঁচ মিনিটের জন্য লইয়া যাইতেছি। একটি স্ত্রীলোক মা'র নিকট কিছু গোপনীয় কথা বলিবেন। আপনারা পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।" মা বলিলেন, "পাঁচ মিনিটে কি আর হইবে!" মা'র কথা শুনিয়া আমরা বুঝিলাম যে, এবারকার মত মা'র কথা এই শেষ। বাস্তবিক মা'র সঙ্গে আর কোন কথা হইল না। ইহার পর মা যতক্ষণ ছিলেন, মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে মা'র ফটো তোলা হইতেছিল। আমরা আশ্রমের বাহিরে বেড়াইতে লাগিলাম।

ঢাকা হইতে মায়ের বিদায়

বিদায়ের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আশ্রমের আঙ্গিনায় দাঁড়াইলেন। সকলে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। ভিড় দেখিয়া আমি একটু দূর হইতেই প্রণাম

করিলাম। নমস্কার করিয়া উঠিয়া দেখি যে, মা আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। তখনও তাঁহার শ্রীচরণে অগণিত মস্তক লুটাপুটি খাইতেছিল। মা'র হাসি দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে, মা আমার প্রণাম গ্রহণ করিয়াছেন। মা'র নিকট দূর বা নিকট নাই। চরণ স্পর্শ না করিয়া প্রণাম করিলেও যে তিনি তাহা গ্রহণ করেন এ কথা মা আমাকে দেরাদুনে বলিয়াছিলেন। আজ তাহাই বোধ হয় চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন।

মা মোটরে উঠিলেন। আমি আশ্রমের বাহিরে আসিতেই খুকুনীদিদির সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "দিদি, গতকল্যের গল্প ত আর শেষ হইল না।" দিদি বলিলেন, "আপনি হয়ত জানেন না যে, কাল সন্ধ্যাবেলা মা হঠাৎ আমাকে বলিলেন, "তুমি না গল্প বলিতেছিলে? যাও গল্পটি শেষ করিয়া আস।" আমি কিন্তু বাহিরে আসিয়া আপনাদিগকে খুঁজিয়া পাইলাম না।" এই বলিয়া দিদি হাসিলেন। এ হাসির অর্থ এই যে, মা'র কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। কারণ দিদি যখন মাঠে বসিয়া আমাদের সঙ্গে গল্প বলিতেছিলেন মা তখন আশ্রমের হট্টগোলের মধ্যে ছিলেন। দিদিকে তিনি দেখেন নাই বা দিদি যে গল্প বলিতেছেন ইহাও শুনেন নাই। অথচ তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। গল্পটি যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তাহার খোঁজও তিনি রাখেন। মা কেবল অন্তর্য্যামিণী নহেন, তিনি আবার "সর্ব্বতোঽক্ষি" ও বটেন। কিছুই তাঁহার অগোচরে হইবার উপায় নাই।

মাকে বিদায় দিয়া আমরা ভগ্ন মনে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। এ কয়দিন একটা উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম। আজ অবসাদ—শুধু অবসাদ।

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.